গাঢ়লাল ফিকে লাল

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বিশ্বের বিনিয়োগকারী এখানে আসুন : বসু

হিন্দুজারা শিল্প গড়বে ? জানি না তো : সুরজিৎ

নৃপেনবাবুকে 'বিশ্রাম' নিতে বলল সিপিএম

পথসভা থেকে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝাড়গ্রামবাসী সশস্ত্র ক্যাডাররা

রশিদ-মামলা : সরে দাঁড়াল দুই রাজসাক্ষী

গাঢ় লাল
ফিকে লাল

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

এস. আর. পাবলিশিং কনসার্ণ
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণঃ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৯৫

প্রচ্ছদঃ স্নেহাশীষ অধিকারী

এস. আর. পাবলিশিং কনসার্ণ এর পক্ষে শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং দে'জ অফসেট্ ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্যঃ ২৫.০০

।। উৎসর্গ ।।

আমার বাবা সুনীল সেনগুপ্ত

মা গীতা সেনগুপ্ত

এবং

সমস্ত সচেতন মানুষকে

মুখবন্ধ

গোড়াতে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। কমিউনিস্ট পার্টির কোনও ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা এ বইয়ে করিনি। সে উদ্দেশ্যও আমার ছিল না। আমি এই বই লেখার ক্ষেত্রে প্রথমত, এবং প্রধানত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) ও তাকে ঘিরে কয়েকটি প্রসঙ্গকেই বেছে নিয়েছি। আমি এটাই দেখাতে চেয়েছি যে ক্ষমতায় আসার পূর্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-র দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ কীরকম ছিল; দীর্ঘ সতের বছর এই রাজ্যে ক্ষমতার প্রধান শরিক হয়ে থাকার পরে সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে। এটা দেখাতে গিয়ে আমাকে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার ইতিহাস কিছুটা, দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকাল—এসব প্রসঙ্গক্রমে আনতে হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-র দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের এই পরিবর্তন বোঝাতে গিয়ে উদাহরণস্বরূপ কিছু কিছু ঘটনা আমাকে তুলে দিতে হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব ঘটনা আমার পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।

অনেকে এমন প্রশ্ন করতেই পারেন যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-কেই আমি বেছে নিলাম কেন? এক্ষেত্রেও আমার একটাই উত্তর। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি এই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিই। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং আচরণে যে চমকপ্রদ সব পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে—লেখার পক্ষে তাকেই যথেষ্ট আকর্ষণীয় বিষয় বলে মনে হয়েছে আমার।

এই বইটি লেখার ক্ষেত্রে অনেকেই আমাকে অনেকভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি একান্তভাবে ঋণী। আমার বন্ধু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক—যাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতা না পেলে বইটি লেখাই হত না, আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। আমি কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক নিশীথ দে মহাশয়ের কাছে। তিনি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আমাকে সরবরাহ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ আমার সহকর্মী আলোকচিত্রী সুব্রত মজুমদারের কাছে। এই বইয়ে ব্যবহারের জন্য দেওয়া ছবিগুলি তাঁরই। আমি কৃতজ্ঞ আমার সহকর্মী প্রসূন আচার্যর কাছেও। প্রয়োজনীয় তথ্য তিনিও সরবরাহ করেছেন আমাকে। এছাড়া, আমি কৃতজ্ঞ অলোক দাস, মুকুল রায়, বাণী সিংহ রায়, এ পি ডি রায় এবং নাগরিক মঞ্চের কাছে। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা ও লিফলেট থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি আমি।

এই বইয়ে যদি কিছু ভুলত্রুটি থেকে গিয়ে থাকে তার সমস্ত দায়িত্ব আমার। বইটি পাঠকদের ভালো লাগলেই তা হবে আমার পরম পাওনা।

বইটি অন্যান্য ভাষার পাঠকদের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ চলছে।

কলকাতা
জানুয়ারী, ১৯৯৫

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

এক

রবার্ট ম্যাকনামারা কলকাতায় এসে কালোপতাকা দেখেছিলেন। কালো হাত ভেঙে দেওয়া, গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুঙ্কার শুনে তাঁকে ছুঁতে হয়েছিল কলকাতার মাটি। রবার্ট ম্যাকনামারার সেই কলকাতা সফরের সময়ে কলকাতার বামপন্থী ছাত্র এবং যুব সমাজ ছিলেন বিক্ষোভে উত্তাল। ভিয়েতনামে মার্কিনি আগ্রাসনের প্রতিবাদে তখন কলকাতার আকাশ-বাতাস আলোড়িত হচ্ছে। 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম' এই শ্লোগানে। ষাটের দশকে, বামপন্থী ছাত্র এবং যুবকের আন্দোলনে আলোড়িত কলকাতায় পা রেখেছিলেন বিশ্বব্যাঙ্কের তদানীন্তন প্রধান এই ম্যাকনামারা। জাতিতে যিনি মার্কিনি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূরূপেই সেদিন, সেই ষাটের দশকে তাঁকে দেখেছিলেন বামপন্থী ছাত্র-যুবরা। দেখেছিলেন বামপন্থী নেতারাও। তার তিন দশক পরে, এই ৯৪ সালের অক্টোবর মাসের গোড়ায় আর এক মার্কিনি কলকাতায় পদার্পণ করেন। এই মার্কিনি ব্যক্তিটির নাম ফ্র্যাঙ্ক ওয়েজনার। যে অভিজ্ঞতা ম্যাকনামারার হয়েছিল কলকাতা সফরের সময়, তিন দশক পরে বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান সেই কলকাতায় ঠিক সেই অভিজ্ঞতা কিন্তু ওয়েজনারের হয়নি। বরং, ম্যাকনামারার কলকাতা সফরের সঙ্গে ওয়েজনারার কলকাতা সফরের অভিজ্ঞতা একেবারে স্বতন্ত্র, ভিন্ন।

ওয়েজনারের পরিচয়, তিনি ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত। অক্টোবর মাসের গোড়ায় কলকাতা সফরে এসে একজন রাষ্ট্রদূতের যা যা করণীয় ওয়েজনার তাই করেছেন। কিন্তু তা করার পরও, ওয়েজনার কলকাতায় এমন একটি কাজ করেছেন, যা বঙ্গীয় বামপন্থী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে আজ। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্র্যাঙ্ক ওয়েজনার কলকাতা সফরে এসে তাঁর নানাবিধ কাজকর্মের ফাঁকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে রাজ্য বামফ্রন্টের প্রধান শরিক মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সদর দপ্তরে উপস্থিত হয়েছিলেন। একান্ত আলোচনায় বসেছিলেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্যের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে। এবং ওয়েজনারের সঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতাদের সেই একান্ত আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল রাজ্যে শিল্প স্থাপনে মার্কিনি পুঁজি বিনিয়োগের প্রসঙ্গটি।

লক্ষ্য করে দেখুন, ম্যাকনামারা এবং ওয়েজনারের এই দুটি কলকাতা সফরের পার্থক্য কী আকাশ-পাতাল। ম্যাকনামারা কালো পতাকা দেখেছিলেন। ম্যাকনামারাকে 'ফিরে যাও' ধ্বনি শুনতে হয়েছিল। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কেন, রাজ্যের কোনও বামপন্থী দলের মূল শিবিরই ম্যাকনামারার জন্য দরজা খুলে দেয়নি সেদিন। আর ওয়েজনার? ওয়েজনার তাঁর কলকাতা সফরের সময় একটিও কালো পতাকা দেখেননি। এক মিনিটের জন্যও ফিরে যাও ধ্বনি শুনতে হয়নি তাঁকে। কলকাতার আকাশ-বাতাস একবারের জন্যও মুখরিত হয়নি ওয়েজনারের কালো হাত ভেঙে দেওয়া, গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবিতে। এসব তো হয়ইনি, উপরন্তু, ওয়েজনার পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বাম

রাজনৈতিক শক্তি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সদর দপ্তর পরিদর্শন করেছেন। মার্কিনি পুঁজি বিনিয়োগের প্রসঙ্গটি নিয়ে একান্ত আলোচনা সেরেছেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য প্রধানদের সঙ্গে।

গোড়াতেই এই দুটি পরস্পরবিরোধী ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম এই কারণেই যে, তিন দশকের ব্যবধানে এ রাজ্যের বামপন্থী নেতৃত্বের চেহারা-চরিত্র বদলের রূপটি ধরা পড়ে যাচ্ছে এখানেই। রবার্ট ম্যাকনামারা ষাটের দশকে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন বামপন্থীরা বিরোধী শক্তি। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে তখন তাঁদের লড়াই। আর ওয়েজনার যখন কলকাতায় ঘুরে গেলেন, তখন বামপন্থীরা শাসকের আসনে। শুধু শাসকের আসনেই নয়। দীর্ঘ সতের বছর সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন ক্ষমতার সমস্ত স্বাদই তাঁরা গ্রহণ করেও ফেলেছেন।

অবশ্য ওয়েজনারের এই কলকাতা সফর এবং তাকে কেন্দ্র করে বামপন্থীদের এই চেহারা চরিত্র বদল নিয়ে আজ যে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে, সে প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য শীর্ষ নেতাদেরও কিছু বক্তব্য রয়েছে। আলোচনায় বিস্তৃতভাবে যাওয়ার আগে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য শীর্ষ নেতাদের সেই বক্তব্য না জানিয়ে দেওয়াটাও একান্তই অন্যায় হবে। তবে, তার আগে এটাও বলা দরকার যে ওয়েজনারের ওই আলিমুদ্দিন স্ট্রিট গমনের সংবাদটি প্রথমে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বেমালুম চেপেই গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য সংবাদপত্রে তা প্রকাশ হয়ে পড়ার পর তাঁরা আর অস্বীকার করতে পারেননি।

ওয়েজনার কলকাতা সফরের এসে গত ৩রা অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সদর দপ্তরে গিয়ে রাজ্য শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। এবং তার পরদিন থেকেই এই বৈঠককে কেন্দ্র করে নানা মহলে, এমনকি বাম মহলেরও একাংশে নানা প্রশ্ন এবং নানা সংশয়ের উদয় হতে থাকে। যাবতীয় প্রশ্ন এবং সংশয়ের ওপর জল ঢেলে দেওয়ার জন্য ৭ই অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির মুখপত্র গণশক্তিতে দলের রাজ্য সম্পাদক শৈলেন দাশগুপ্তর একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

গণশক্তিতে প্রকাশিত ওই বিবৃতিটি কী ছিল? বিবৃতিটি হুবহুই তুলে দিচ্ছি।

'সি পি আই (এম) রাজ্য দপ্তরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আসাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ব্যাপক হৈ চৈ হচ্ছে। কয়েকটি সংবাদপত্রে রীতিমতো ঠাট্টা-বিদ্রূপও করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক শৈলেন দাশগুপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আমাদের পার্টি অফিসে বিদেশি রাষ্ট্রদূতের আসা নতুন কোনও ঘটনা নয়। বহুকাল ধরে প্রায় প্রতিবছরই কোনো না কোনো দেশের রাষ্ট্রদূত আমাদের পার্টি দপ্তরে আসছেন। এঁদের মধ্যে যেমন সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রদূত আছেন, তেমনি আছেন পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রদূতরাও। এখন আমরা সরকারে আছি বলেই যে বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা আসছেন, সেটা যেমন ঘটনা নয়, তেমনি আমরা রাজ্যের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি বলেই যে তাঁরা আসছেন ঘটনা তাও নয়। যখন আমরা সরকারে ছিলাম না, বা রাজ্যের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইনি তখনও বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা আমাদের অফিসে এসেছিলেন। এইসব রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রদূতরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রদূতরাও।

'দাশগুপ্ত বলেন, অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সময়ও ফরাসি ও তৎকালিন পশ্চিম জার্মানির রাষ্ট্রদূতরা আমাদের পার্টি অফিসে এসেছিলেন। এবং পার্টির তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন সময় যেসব দেশের রাষ্ট্রদূতরা আমাদের পার্টি অফিসে এসেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, মেক্সিকো, নামিবিয়া, তানজানিয়া প্রভৃতি।

'দাশগুপ্ত বলেন, মার্কিন রাষ্টদূত ওয়েজনারের পার্টি অফিসে আসাকে ঘিরে সম্প্রতি যে হৈ-চৈ হচ্ছে তাঁর আগের দুজন রাষ্ট্রদূতও আমাদের অফিসে এসেছিলেন। তাঁদের একজন এসেছিলেন ১৯৮৬ সালে, অন্যজন ১৯৮৮ সালে।

'তিনি বলেন, এছাড়া যখনই কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রদূত কলকাতায় আসেন তাঁরা একবার অন্তত আমাদের অফিসে ঘুরে যান। বিগত বছরগুলিতে কোনো না কোনো সময়ে এক বা একাধিকবার চীন, পুরনো সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভিয়েতনাম, পূর্বতন চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রদূতরা আমাদের অফিসে ঘুরে গেছেন।

'দাশগুপ্ত বলেন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিজেদের মনগড়া রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পার্টি অফিস সফরকে কেন্দ্র করে যা প্রচার হচ্ছে, সেটাও জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই করা হচ্ছে।'

গণশক্তির পাতায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটি কিন্তু গোটা ঘটনাটিকে অতি সরলীকৃত করার একটি প্রয়াস মাত্র। বামপন্থী চেহারা চরিত্রে এবং আচরণে বদল যে ধরছে—অন্তত এই দীর্ঘ বিবৃতির ভিতর দিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদক যুক্তিনিষ্ঠভাবে তা অস্বীকার করতে পারেননি। কেন করতে পারেননি? ওয়েজনারের এই কলকাতা সফর এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে একান্ত বৈঠক সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করলেই কিন্তু এই সরলীকরণ করে দেবার প্রয়াসটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে। অবতারণা করা যেতে পারে যে প্রশ্নগুলি, সেগুলি এরকম:

* একথা ঠিকই যে, ওয়েজনারের আগেও দুজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮ সালে কলকাতায় এসে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সদর দপ্তরে ঘুরে গেছেন। কিন্তু সেই দুজনের পার্টি অফিস আগমন নিয়ে যখন গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়নি, তখন কেন হঠাৎ ওয়েজনারের পার্টি অফিস পরিদর্শন নিয়ে গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছিল? একথা তো ঠিকই যে, সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়ে না পড়লে ওয়েজনারের বাম নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের ঘটনাটি পর্দার আড়ালেই থেকে যেত।

* দ্বিতীয়ত, যখন খোলা শিল্পনীতির কথা বলছে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারও, এখানেও শিল্পায়নের জন্য যখন বিদেশী এবং বহুজাতিক পুঁজিকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, যখন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে ওয়েজনার পশ্চিমবঙ্গে মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগের প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করছেন—তখন পরিবর্তনের কিছু ইঙ্গিত কি বহন করছে না তা?

* তৃতীয়ত, ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কলকাতার বুকে পা দিয়েছিলেন বলেই তিন দশক আগে কালো পতাকা দেখতে হয়েছিল রবার্ট

ম্যাকনামারাকেও। তিন দশক পরে এখন গ্যাট চুক্তি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আর্থিক নীতির ভিতরও বঙ্গীয় বামপন্থীরা খুঁজে পেয়েছেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই 'চক্রান্তের' বিরুদ্ধে যখন বঙ্গীয় বামপন্থীরা এখানে প্রচার অভিযান করছেন, ঠিক তখনই ওয়েজনার ঘুরে গেছেন কলকাতায়। নির্বিঘ্নে ঢুঁ মেরে গেছেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্যের সদর দপ্তরে। এই দ্বিমুখী আচরণের পরও চরিত্র বদল সম্বন্ধে কোনও সংশয়ই জাগবে না?

মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদক ওয়েজনারের সফরকে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় বামপন্থার চেহারা-চরিত্র এবং আচরণ বদল সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে তাকে 'সংবাদপত্রের বিভ্রান্তি সৃষ্টির' চেষ্টা বলেছেন। কিন্তু ঘটনার বিশ্লেষণে গেলে সরলীকরণের এই প্রয়াস কি আর ধোপে টেকে?

বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান এই পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক দশকে, বিশেষ করে, বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত সতের বছরে, বামপন্থী চেহারা চরিত্র এবং আচরণে কী বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে, কী দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে এখনও তার আরও হাজারটা উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিস্তৃত আলোচনার ভিতর বারেবারেই সেই বদল এবং বিস্মরণের উদাহরণগুলি আমরা তুলে ধরব। তবে বিস্তারিত আলোচনার আগে, যেমন পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে বাম শক্তিগুলির ভিতর তার আর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই।

এই ৯৪ সালেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র গণশক্তির শারদ সংখ্যার বিজ্ঞাপনে জানানো হল—

'১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি এস ইউ) অভ্যন্তরে চলে একের পর এক পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনের গতিধারা কী ছিল? আদৌ কি সেই পরিবর্তন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে এবং সি পি আই (এম)-র মতামত ব্যক্ত করতে সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তদানীন্তন সি পি এস ইউ-র পলিটব্যুরোর দুবার (১৯৮৭ এবং ১৯৯০) শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা হয়। সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর নেতা ছিলেন কমরেড এম. বাসবপুন্নাইয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় কমরেড ডব্রিনিন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় কমরেড ইয়োকোভলেক। সেই সমস্ত আলোচনায় দুই পার্টির মধ্যেকার মতাদর্শগত পার্থকটি ছিল স্পষ্ট এবং আপসহীন। কী সেই পার্থক্য? সি পি এস ইউ নেতারা কী তথ্য নিয়ে এগোতে চেয়েছিলেন? সেক্ষেত্রে সি পি আই (এম)-এর বক্তব্য কী ছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব লিপিবদ্ধ রয়েছে উপরোক্ত দুটি আলোচনার রেকর্ড বা কার্যবিবরণীতে। এতদিন এই দলিল ছিল আন্তঃ কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল। এবারের গণশক্তির শারদ সংখ্যায় সেই দলিলের পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত হচ্ছে।'

গণশক্তিতে ৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটির রাজনৈতিক গুরুত্ব কিন্তু অসীম। আন্তঃ কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল কমিউনিস্ট পার্টির একান্ত গোপনীয় দলিল। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক মানচিত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপর্যয়ের নিরিখে এই দলিলটি তো আরও গুরুত্বপূর্ণ। সেই আন্তঃ কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল যখন মার্ক্সবাদী

কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ করতে চাইছে—তখন বুঝতেই হবে, শুধু কমিউনিস্ট পার্টিতে নয়, কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও অনেক রকম পরিবর্তন ঘটেছে।

এই যে দুটি পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করলাম, এই পরিবর্তন দুটি কিন্তু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলি ঝেড়ে ফেলে, নতুনভাবে বিচার-বিশ্লেষণের দিকে যাওয়ারই পরিবর্তন। নিজেদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন না ঘটালে, সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর এ রাজ্যের মার্ক্সবাদীরাও ক্রমেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বেন। অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তে চাননি বলেই এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ার সেই আশঙ্কা থেকেই মার্ক্সবাদীরা পুরনো ধ্যান-ধারণা কিছু ঝেড়ে ফেলে নতুন করে নিতে চাইছেন নিজেদের। এভাবে। তাঁদের এ পরিবর্তনটা কিন্তু জনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা যাতে নষ্ট না হয়, তারই প্রয়াস মাত্র।

কিন্তু, এই পরিবর্তন ছাড়াও, গত সতের বছরে মার্ক্সবাদী চরিত্রে আরও বড়ো বদল ঘটেছে। সে বদল একেবারেই বৈপ্লবিক বদল। গত প্রায় দুই দশক ধরে ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে মার্ক্সবাদীরা তাঁদের অনেক পুরনো স্বভাব-অনেক পুরনো কথাবার্তা-চিন্তাধারাই বদলে ফেলেছেন। বদলে ক্ষমতাসীন মার্ক্সবাদীদের এক নতুন চেহারা প্রকাশ পেয়েছে গত দুই দশকে। এবং, এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁদের চারিত্রিক কন্ট্রাড্রিকশনও প্রকট হয়ে পড়েছে।

ক্ষমতায় থাকার জন্যই মার্ক্সবাদীদের চরিত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে গত সতের বছরে, আমরা সেই নিয়েই আলোচনা করব। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র, যেমন গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকারসমূহ, মার্ক্সবাদী জীবনযাপন, আইন-শৃঙ্খলা, দুর্নীতি, প্রশাসন, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে মার্ক্সবাদীদের ক্ষমতায় আসার আগে কী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, গত সতের বছর ক্ষমতায় থাকার পর কী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁরা পোষণ করেছেন—সেটাই খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব। এবং তা দেখার চেষ্টা করতে গেলেই আমরা দেখতে পাব—ক্ষমতায় আসার আগে মার্ক্সবাদীরা যা বলতেন, যা বিশ্বাস করতেন—সতের বছরে ক্ষমতায় থাকার পরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কার্যক্ষেত্রে তাঁরা তা বিশ্বাস করেন না, বা বলেন না। বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকাই পালন করেন তাঁরা।

মার্ক্সবাদীদের এই চরিত্র বদল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্পটলাইটটা স্বাভাবিকভাবেই থাকবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ওপর। থাকবে এই কারণেই যে, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত এখন রাজনৈতিক শক্তির নিরিখে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিই প্রধান কমিউনিস্ট পার্টি। শাসক বামফ্রন্টের তারাই প্রধান এবং বড়ো শরিক। মার্ক্সবাদীদের চরিত্র বদলে যাওয়ার বিষয়টি তাঁদের ভিতরই প্রকট হয়েছে বেশি। এই চরিত্র বদলের প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গেলেই আমরা দেখতে পাব, মার্ক্সবাদী শাসনের সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ানটি। ৭৭ সালে জনগণ কী আশা-আকাঙ্খা নিয়ে মার্ক্সবাদীদের ক্ষমতায় এনেছিল, এবং সতের বছর পর মার্ক্সবাদীরা কী দিতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সেই সার্বিক চিত্রটি।

তার আগে অবশ্য আমাদের একবার দেখে নিতে হবে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন ও তৎপরবর্তী দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলের ঘটনাবলীকে।

দুই

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা নিয়ে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেছেন ১৯২০ সালের অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সূচনা হয়। কেউ বলেন, ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে তাসখন্দের ইন্ডিয়া হাউসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। আবার কারোর কারোর মতে ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর কানপুরে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির। এই তিন মতের স্বপক্ষেই যুক্তি তর্ক রয়েছে। সেটি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। তা নিয়ে আমরা আলোচনা করবও না। আমরা কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জন্মপর্বটি এখন দেখব। বিশের দশকের গোড়ার দিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হওয়ার চার দশক পর পার্টিতে প্রথম বড় ভাঙনটি আসে। ১৯৬৪ সালে ভেঙে দু টুকরো হয়ে পড়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। একটি অংশ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামেই থেকে যায়, অন্য অংশটি আত্মপ্রকাশ করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে।

অবশ্য, ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের আগেই একবার মার্কসবাদীরা ক্ষমতার আস্বাদটি কিছুদিনের জন্য হলেও গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন (৬৩টি আসন পেয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি) জিতে কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট সরকার গঠন করেছিলেন মার্ক্সবাদীরা। বামপন্থী আন্দোলনের ওটি একটি স্মারক। অবশ্য ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বাধীন ওই সরকারের আয়ু ছিল নিতান্তই স্বল্প। সে প্রসঙ্গেও আমরা কোনও আলোচনায় যাচ্ছি না এখানে।

১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার পিছনে কতগুলি মতাদর্শগত বিরোধ কাজ করেছিল। এই মতাদর্শগত বিরোধগুলি পার্টিতে ক্রমশ ব্যক্তিগত বিরোধ এবং ক্ষমতা দখলের লড়াইতে রূপ নেয়। তারই ফলশ্রুতিতে ৬৪ সালে পার্টি বিভাজন আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এসব মতাদর্শগত বিরোধগুলি প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং যেগুলি বাড়তে বাড়তেই কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে গোষ্ঠী রাজনীতি ও ভাঙনের পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল পার্টিকে, সেগুলি এইরকম। জাতীয় গণতান্ত্রিক পথ, না জনগণতান্ত্রিক পথ, কংগ্রেসের ভিতর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির মূল্যায়ন, দেশের স্বাধীনতালাভের সময় দ্বিজাতিতত্ত্বকে স্বীকার করে নেওয়া—এইসব নিয়ে প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে মতদ্বৈধতা ছিল। এইসব মতদ্বৈধতা থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে জন্ম নিয়েছিল যোশি গোষ্ঠী, ডাঙ্গে গোষ্ঠী, রনদিভে গোষ্ঠী। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মতদ্বৈধতার পাশাপাশি গোষ্ঠী রাজনীতিটিও ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছিল প্রবলভাবেই। ৫৭ সালের নির্বাচনে কেরলে প্রথম কমিউনিস্ট সরকার 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা দখলের' পরে আরও একটি মতাদর্শগত প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রবল বিরোধ ছড়িয়ে পড়ল। কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে একদল যেমন এভাবে ক্ষমতা গ্রহণের বিরোধিতাই করলেন, অন্য একটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এই সংসদীয় কাঠামোয় ক্ষমতা দখলের ওপরই জোর দিলেন। নির্বাচনী মোহগ্রস্ত বিরোধী বলে যাঁরা সেই সময় খ্যাত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের। পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এঁদের বক্তব্য ছিল—পার্টি নির্বাচনের প্রতি

মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং বিপ্লবের লক্ষ্য থেকে ক্রমশই সরে যাচ্ছে। পার্টি নেতৃত্বের এই মনোভাবের ফলে শ্রেণীসংগ্রাম এবং সংগ্রামী আন্দোলন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছিলেন এঁরা তখন। অথচ, চার দশক পরে আজ পশ্চিমবঙ্গেই বঙ্গীয় বামপন্থীরা সংসদীয় ব্যবস্থাকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ভেবেছেন, বিপ্লবকে নয়। এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যখন বিরোধ চলছিল এবং ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ করছিল কমিউনিস্ট পার্টির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, তখন আবার বিরোধের আগুনে ঘি ঢাললো আর একটি নতুন ঘটনা। ১৯৬০ সালের ২২ এপ্রিল, লেনিনের জন্মদিনে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কড়া ভাষায় সমালোচনা করলো সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অভিযোগ তুললো, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমশই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই কমিউনিস্ট পার্টির এই বিরোধ রেখাপাত করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরেও দুটি ভাগ স্পষ্ট হয়ে গেল—চীনাপন্থী এবং রুশপন্থীতে।

এরই ভিতর আবার ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ বাধলো। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরেও মতবিরোধ আরও প্রবল হল। চীন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং তার সরকারকে 'সম্প্রসারণবাদী' বলে আখ্যা দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে চীনাপন্থীরা চীনের এই বক্তব্যকে সমর্থন জানালেন। দলের ভিতর রুশপন্থী যাঁরা তাঁরা আবার সমর্থন জানালেন জওহরলালকেই। কমিউনিস্ট পার্টির ভিতর চীনাপন্থী বলে পরিচিত নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো হল। পশ্চিমবঙ্গের চীনাপন্থী নেতাকর্মীরাও বাদ গেলেন না কেউ।

এইসব ঘটনাবলীই কমিউনিস্ট পার্টিকে দ্রুত ভাঙনের পথে নিয়ে চললো। চীনাপন্থী নেতাকর্মীরা আটক হওয়ার পর এবং কার্যত পার্টি রশ-চীন দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যাওয়ায়, জেলে আটক চীনাপন্থীরা এবার তৈরি হাতে থাকলেন বাইরে বেরিয়েই পার্টি নেতৃত্বকে আক্রমণ করার জন্য। পার্টি নেতৃত্ব তাঁদের চোখে হয়ে দাঁড়ালেন সংশোধনবাদী।

কিন্তু চীনাপন্থীরাও কি এক ছিলেন? তাও ছিলেন না। তাঁদের ভিতরও নানারকম গোষ্ঠীবিন্যাস ছিল। সেইসময় চীনাপন্থী হিসাবে যাঁরা জেলে আটক ছিলেন, পরবর্তী কালে বেরিয়ে এসে তাঁরাই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। কিন্তু সেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও যে জন্মের আগে থেকেই আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল গোষ্ঠী রাজনীতিতে তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতাদের জবানিতে। এই গোষ্ঠী রাজনীতির ফলশ্রুতিতেও মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এ রাজ্যে জ্যোতি বসুর গোষ্ঠী, প্রমোদ দাশগুপ্তর গোষ্ঠীতে পরিচিত হয়েছিল। আর আজ তো আরও অনেকের গোষ্ঠী আছে।

জেলে আটক চীনাপন্থীদের এই ঘরের মধ্যে ঘর তখন কেমন ছিল? হরিনারায়ণ অধিকারীর লেখা থেকে খানিকটা অংশ তুলে দিই, তাহলেই বিষয়টা বোঝা যাবে পরিষ্কার।

হরিনারায়ণ অধিকারী লিখেছেন-'কিন্তু জেলের অভ্যন্তরে কি আটক নেতৃবৃন্দ সব বিষয়ে একমত ছিলেন? পশ্চিমবঙ্গের দমদম কেন্দ্রীয় কারাগারের সে সময়কার ঘটনাবলী অনুসারে বলা যায়, না। পার্টির আটক নেতৃবৃন্দ অন্তত এই জেলে একমত ছিলেন

না। এই সময়তে চীন আসামের বমডিলা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে একতরফা 'সিজফায়ার' (যুদ্ধবিরতি) করে। প্রস্তাব ওঠে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসার। সিংহলের (শ্রীলঙ্কা) প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়ক চীনভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য এগিয়ে আসেন এবং প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবই 'কলম্বো প্রস্তাব' নামে খ্যাত। দমদম জেলে আটক কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে কলম্বো প্রস্তাব মানা না মানাকে কেন্দ্র করে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। এই জেলে তখন শতাধিক নেতা ও কর্মী আটক। এর মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছজন জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুগামী, এঁরা জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবেব পক্ষে অর্থাৎ ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে। বাকিদের মধ্যে জ্যোতি বসু, সরোজ মুখার্জি, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, মহম্মদ ইসমাইল, অমৃতেন্দু মুখার্জি সহ প্রায় দশ বারোজন কলম্বো প্রস্তাব মেনে নিয়ে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার পক্ষে। আর, সংখ্যাধিক্য অংশ চীনের প্রস্তাব মেনে বিরোধ মীমাংসার পক্ষে। এই ইস্যুটি নিয়ে মতবিরোধ আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেলেও, প্রকৃত বিরোধের ক্ষেত্র অন্যত্র। বিশেষ করে জ্যোতি বসু প্রমুখরা পাল্টা পার্টি কেন্দ্রগঠন, জেল থেকে পাল্টা কেন্দ্র গঠনের নেতৃত্ব দান, আড়ালে-আবডালে পাল্টা পার্টি গঠনের কথাবার্তা, সব বিষয়ে চীনের পার্টির মতামতকে সমর্থন ইত্যাদি মেনে নিতে পারছিলেন না। জ্যোতি বসু প্রমুখরা যে কয়জন এরকম ভাবনা চিন্তা করতেন তাঁরা তাঁদের মতামত সম্বলিত একটি খসড়া দলিলও জেলের অভ্যন্তরে তৈরি করেছিলেন। পরে জানা যায়, এই দলিলটা জেলের বাইরে স্বাধীনতা পত্রিকার চিফ রিপোর্টার অধীর চক্রবর্তীর হাতে হাওড়ায় আটক কমরেড গোবিন্দ কাঁড়ার মারফৎ এসে পৌঁছায় এবং পরে তা এ কে গোপালনের হস্তগত হয়। এই দলিলটিই পরে পশ্চিমবঙ্গে সেন্ট্রিস্টদের বা মধ্যপন্থীদের দলিল নামে পরিচিতি লাভ করে। দমদম জেলের অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়েই জ্যোতি বসুদের সাথে প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখদের মতবিরোধ তীব্র হতে থাকে। পারস্পরিক সম্পর্কও হয়ে ওঠে তিক্ত। কার্যত দমদম জেলের আটক কমিউনিস্টরা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙারদের নেতৃত্বে বিরাট অংশের গ্রুপ, জ্যোতি বসুদের দশ বারোজনের গ্রুপ, সুশীল চ্যাটার্জিদের পাঁচ-ছয়জনের গ্রুপ। তিন গ্রুপভুক্ত কমরেডরা একে অন্যের সাথে কথা বলার কমরেড সুলভ মনোভাবও হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখার সেলগুলির সম্মুখভাগে প্রশস্ত রাস্তা। এই রাস্তায় রাজনৈতিক বন্দীরা বিকেলে 'লক-আপের' পূর্ব পর্যন্ত পায়চারি করতেন, বেড়াতেন। কিন্তু তিনটে গ্রুপের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন তিক্ত দাঁড়ালো যে, একসঙ্গে তিন গ্রুপভুক্ত কমরেডরা হাঁটাচলা করতে পারতেন না। এক গ্রুপের পায়চারি বা বেড়ানো শেষ হলে অন্য গ্রুপ বেড়াতো। সবশেষে বেড়াতো দাশগুপ্ত-কোঙারদের বিরাট কমরেড বাহিনী। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের তিক্ততা এই পর্যায়েই শেষ হল না। দমদম জেলে এই গোষ্ঠী বিরোধের ফলে রন্ধনশালা (কিচেন) ভাগের প্রশ্নও উঠেছিল। অনেকে মনে করতেন একই রন্ধনশালায় সকলের রান্নাবান্না সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত এই তিক্ততা পরিহারের ভূমিকা নেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই রন্ধনশালা ভাগ হয়নি। জেলের অভ্যন্তরে ছোটখাটো আরও অনেক এমন ঘটনা ঘটেছে, যা গল্পগাথার হাসি ঠাট্টার মতো। এই জেলে অল্পবয়সী কিছু জুনিয়র কমরেড ভারতরক্ষা আইনে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে প্রথম শ্রেণীর বন্দিরূপে সশ্রম কারাদণ্ড

ভোগ করছিলেন। এই কমরেডদের সাথে বিনা বিচারে আটক কমরেডদের মেলামেশা আইনের চোখে নিষিদ্ধ। বাস্তবে নিষেধাজ্ঞা মানা হত না। প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসুদের উভয় গ্রুপের পক্ষ থেকে সাজাপ্রাপ্ত কমরেডদের জেলে সিনিয়ার কমরেডরা যাতায়াত করতেন, যোগাযোগ রক্ষা করতেন, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করতেন। অবহিত রাখতেন পার্টির সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে। চলতো জেলে আসা গোপন দলিলের আদান-প্রদান। এরকম পরিস্থিতিতে একদিন সন্ধ্যায় সাজাপ্রাপ্ত কমরেডদের সেলের সদর দরজায় প্রমোদ দাশগুপ্তর সঙ্গে ওই জুনিয়র কমরেডদের আলোচনা চলছিল। প্রমোদ দাশগুপ্ত বলছিলেন-'তোমরা কী ভাবছো?' প্রত্যুত্তরে জুনিয়র কমরেডদের একজন বলেছিল-'জেলের অভ্যন্তরে পার্টি নেতাদের মতবিরোধ থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতি ভালো লাগছে না, মেনে নিতে পারছি না। আমাদের নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত-জ্যোতি বসুর অন্তত জেলে ঐক্যবদ্ধভাবে চলা উচিত। জেলের বাইরে এসব নিয়ে আলাপ-আলোচনা চললেই ভালো হত। এর উত্তরে হাসির ছলে প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, 'তুমি কি জিন্না-গান্ধীর ঐক্যের কথা বলছ?' জুনিয়র কমরেড নম্রভাবে জানালেন-'প্রমোদ দাশগুপ্ত বা জ্যোতি বসুকে আমি জিন্না বা গান্ধী মনে করি না।'

বলে রাখা ভালো, প্রমোদ দাশগুপ্তর সঙ্গে যে কমরেডের এইরকম কথাবার্তা হয়েছিল বলে হরিনারায়ণ অধিকারী জানিয়েছেন, সেই কমরেডটি আর কেউই নন, হরিনারায়ণ অধিকারী নিজেই।

হরিনারায়ণ অধিকারীর লেখা থেকে এই অংশবিশেষটি তুলে দিলাম অন্য কারণে। রুশপন্থীদের সঙ্গে মতাদর্শগত এবং পার্টি ক্ষমতা দখলের লড়াইতে নেমে চীনাপন্থীরা আলাদা হয়ে বেড়িয়ে এসেছিল। চীনাপন্থীদের অংশটাই পার্টি থেকে বেড়িয়ে এসে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম দেয়। কিন্তু নতুন পার্টি হিসেবে জন্ম নেওয়ার আগেই এই চীনাপন্থীদের ভিতরও নেতৃত্ব দখলের জন্য কেমন নগ্ন গোষ্ঠী কোন্দল ছিল-হরিনারায়ণ অধিকারীর লেখায় সেটাই ধরা পড়েছে। গোষ্ঠী কোন্দলটি এমন নগ্ন ছিল যে 'একে অপরের সাথে কথা বলার কমরেড সুলভ মনোভাবও' হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই নগ্ন গোষ্ঠী মানসিকতা নিয়েই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল এবং এই নগ্ন গোষ্ঠী মানসিকতা নিয়ে এখনও পর্যন্ত চলছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির আয়তন যতো বড়ো হয়েছে, পার্টি ক্ষমতার আস্বাদ যত বেশি করে পেয়েছে—ততই এই গোষ্ঠী মানসিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, পার্টিকে একটি মধুভান্ড মনে করে প্রত্যেক গোষ্ঠীই চেয়েছে অন্য গোষ্ঠীকে তাঁবে রেখে পার্টির ক্ষমতাটি নিজেই দখল করতে। এই চূড়ান্ত গোষ্ঠী বিরোধ থেকেই একসময় দলের উত্তর চব্বিশ-পরগনা জেলা কমিটির ওপর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে বাসবপুন্নায়া কমিশন বসানো হয়েছিল। পার্টিকে তাঁবে রাখার প্রচেষ্টাতেই প্রমোদ দাশগুপ্তর প্রয়াণের পর জ্যোতি বসু এবং তাঁর অনুসারীরা সরোজ মুখার্জিকে রাজ্য পার্টি সম্পাদক পদে বসান। তৎকালীন পলিটব্যুরো সদস্য সমর মুখার্জির নাম পরবর্তী রাজ্য পার্টি সম্পাদক পদে ওঠার পরও জ্যোতি বসু তাঁর অনুসারীদের গোষ্ঠী রাজনীতির প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত সম্পাদক হাতে পারেননি সে সময় সমর মুখার্জি। সরোজ মুখার্জির প্রয়াণের পর শৈলেন দাশগুপ্তকেও এই গোষ্ঠী মানসিকতা নিয়েই রাজ্য পার্টি সম্পাদকের আসনে বসান জ্যোতি বসু এবং তাঁর অনুসারীরা। সরোজ মুখার্জি এবং শৈলেন দাশগুপ্ত—এই দুটি ক্ষেত্রেই যোগ্যতার

চেয়েও বড় হয়েছিল কিন্তু গোষ্ঠী রাজনীতিই। তবে প্রমোদ দাশগুপ্ত যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বে গোষ্ঠী রাজনীতিতে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছিল। প্রমোদবাবুর ব্যক্তিত্বের কারণে সেই সময় জ্যোতি বসু এবং তাঁর অনুসারীরা সংগঠনের কাজে একদম নাক গলাতে আসতেন না। তেমনই, জ্যোতি বসুর ব্যক্তিত্বের কারণে আবার প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং তাঁর অনুসারীরা প্রশাসনের কাজে কখনই নাক গলাতে আসতেন না।

টানা প্রায় দুই দশক ক্ষমতায় থাকার পর এখন এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বটা আরও নগ্ন এবং আরও নক্কারজনকভাবে প্রকাশ পেয়েছে সর্বত্র। পার্টি যতদিন ক্ষমতায় ছিল না তখন পার্টিতে জ্যোতি বসুর লোক, প্রমোদ দাশগুপ্তের লোক বলে পরিচিত ছিলেন অনেকে। কিন্তু তার জন্য জেলায় জেলায়, এমনকি নিচু তলাতেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেষারেষি, ঘৃণ্য গোষ্ঠীবাজি, মুখ দেখাদেখি বন্ধ—এমন অবস্থা ছিল না। কিন্তু ৭৭ সালের পর পার্টি কিছুদিন ক্ষমতায় থাকাতেই জেলায় জেলায়, এমনকি সর্বস্তরের পার্টি কর্মীরা বুঝলেন শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে অনেক অধরা জিনিসই সহজলভ্য হয়। পার্টি যত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যেতে লাগল সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে, বিপ্লবের চিন্তা মাথা থেকে যতই দূরে সরে যেতে লাগল—ততই অধরা জিনিষ ধরার নেশাটা প্রবল হয়ে দেখা দিল কমরেডদের মধ্যে। আর এই নেশা থেকেই পার্টির ক্ষমতাকে নিজের তাঁবে, বা নিজেদের গোষ্ঠীর তাঁবে রাখার মানসিকতা গেড়ে বসল সর্বত্র। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী, রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, লোকাল কমিটি সর্বত্র। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের ভিতর যেমন পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং সংঘাত তীব্র মাত্রায় পৌঁছল, তেমনি জেলা কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, লোকাল কমিটিগুলি সর্বত্র তিন-চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। দলের ভিতরই শুরু হল একের অপরের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত কুৎসা প্রচার, একের অপরকে অপদস্থ করার প্রবণতা। আর এখন, ৯৫-এর রাজ্য পার্টি সম্মেলন এবং পার্টি কংগ্রেসের আগে দাঁড়িয়ে এই চূড়ান্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অন্যতম চিন্তার কারণ।

যা আলোচনা শুরু করেছিলাম তাতে একটু ফিরে যাই আবার। ৬৪ সালে পার্টি ভাগ হওয়ার আগে পার্টির দুপক্ষের নেতাদের ভিতরই কুৎসার বন্যা বয়েছিল। পরস্পরকে আক্রমণ করতে গিয়ে যাবতীয় মতাদর্শ এবং নীতিগত বিরোধ শিকেয় তুলে রেখে স্রেফ ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার এবং আক্রমণে তখন নেমে পড়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। আর এই কুৎসা প্রচার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল কিন্তু বাম আন্দোলনের পীঠস্থান বলে পরিচিত এই পশ্চিমবঙ্গে। পার্টি ভাগ হওয়ার এই প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ পার্টিতে তদানীন্তন রুশপন্থীরা, অর্থাৎ ভবানী সেন, বিশ্বনাথ মুখার্জি, রনেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী এঁরা তদানীন্তন চীনাপন্থী মুজফ্‌ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে তহবিল তছনচের অভিযোগ পর্যন্ত এনেছিলেন। এরই জবাবে আবার জেল থেকে বেরিয়ে মুজফ্‌ফর আহমেদ-প্রমোদ দাশগুপ্তরা পার্টির এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেছিলেন—এই নেতারা পার্টি কেন্দ্র থেকে প্রচুর টাকা পেয়েছেন। তার ওপরও তাঁরা প্রচুর দেনা করেছেন। কেন দেনা করেছেন তা তাঁরাই জানেন।

ভাবুন অবস্থাটা!

তবে, চীনাপন্থী নেতারা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসার পরই এটা পরিষ্কার

বোঝা গিয়েছিল পার্টি ভাগ হচ্ছেই। শুধু কিছুটা সময়ের অপেক্ষা করছিলেন সবাই। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সতের জন সদস্য একটি দলিল পেশ করেছিলেন। ঐ রকমই একটি দলিল পেশ করেন কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকরি সমিতির এগারোজন সদস্যও। এই এগারোজন সদস্যর ভিতর ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও হরেকৃষ্ণ কোঙার। ওই দলিলে বলা হয়েছিল শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে এবং তাঁর গোষ্ঠীর লোকদের কার্যকলাপ পার্টির ঐক্যমত নষ্ট করছে। বলাই বাহুল্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ রুশপন্থীদের বিরোধিতায় এই দলিল জাতীয় পরিষদ বা কার্যকরী সমিতি কোথাওই গৃহীত হয়নি। এরপর, ১৯৬৪ সালের ৪ জুলাই রুশপন্থী এবং চীনাপন্থীদের মধ্যে একটি ঐক্য আলোচনা চালানোর চেষ্টা হয়। দিল্লিতে ভূপেশ গুপ্তের বাড়িতে এই ঐক্য বৈঠক বসে। রুশপন্থীদের পক্ষ থেকে ওই বৈঠকে ছিলেন রাজেশ্বর রাও, গঙ্গাধর অধিকারী এবং ভূপেশ গুপ্ত। আর বিরোধী পক্ষের দিক থেকে ছিলেন জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং হরকিষণ সিং সুরজিৎ। ঐক্য আলোচনা ব্যর্থই হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। ডাঙ্গের বিরোধিতা করে যে দলিল জাতীয় পরিষদে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, সেই দলিলকে সমর্থন করে জাতীয় পরিষদ বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করেছিলেন ৩২ জন সদস্য। তাঁদেরই মূল উদ্যোগে এবার ১৯৬৪ সালের ৭ জুলাই থেকে ১১ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালিতে ডাকা হল কনভেনশন। চীনাপন্থীদের প্রকাশ্যে একটি জোট বাধার প্রচেষ্টা। এই তেনালি কনভেনশনে অংশ নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির ১৪৬ জন প্রতিনিধি। উদ্যোক্তরা দাবি করেছিলেন সেইসময়, এই ১৪৬ জন এক লক্ষ পার্টি সভ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। যে ১৪৬ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন, তাদের ভিতর ছিলেন জাতীয় পরিষদের ৩০ জন সদস্য, কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের ২ জন সদস্য। এই তেনালি কনভেনশন থেকেই ১৯৬৪ সালের ২৪ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তম পার্টি কংগ্রেস ডাকা হল কলকাতায়।

অবশ্য তেনালি কনভেশন থেকে এই পার্টি কংগ্রেস ডাকার আগেই, তেনালিতেই পার্টি ভাগের কাজটি সারা হয়ে গিয়েছিল। শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন একটা পার্টি ঘোষণাই বাকি ছিল। কিন্তু কলকাতায় এই পার্টি কংগ্রেসের ঠিক প্রাক্কালেই প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ কয়েকজন নেতা ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হলেন। তার জন্য পার্টি কংগ্রেসের সময় কিছুটা পেছল। শেষ পর্যন্ত কলকাতার ত্যাগরাজ হলে ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত হল পার্টির সপ্তম কংগ্রেস। এক লক্ষ চার হাজার একুশ জন পার্টি সভ্যের ৪৪২ জন প্রতিনিধি এই পার্টি কংগ্রেসে অংশ নিলেন। এই পার্টি কংগ্রেস থেকেই সমান্তরালভাবে আর একটি কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করল।

১৯৬৪ সালে নতুন যে পার্টি জন্মগ্রহণ করল, তারও নামকরণ করা হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ফলে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামে দুটি পার্টিই চলতে থাকলো পাশাপাশি। ১৯৬৬ সাল অবধি এরকমই চললো। ১৯৬৬ সালে নির্বাচন কমিশন একই নামে দুটি পার্টিকে স্বীকৃতি দিতে অসম্মত হল। আর তারপরই নতুন জন্ম নেওয়া কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নতুন নাম গ্রহণ করল—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) বা সি পি আই (এম)।

মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এই হল জন্মকথা।

তিন

১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হয়ে যাবার তিন বছর পরই ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ক্ষমতার স্বাদটুকু গ্রহণ করল বামপন্থীরা। কংগ্রেসের শাসনকে হারিয়ে ওই বছরই প্রথম ক্ষমতায় বসল যুক্তফ্রন্ট।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। বিশেষ করে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শেষ দিকে মানুষের কাছে চরম অপ্রিয় হয়ে পড়ে কংগ্রেস সরকার। এতটাই অপ্রিয় হয়ে পড়ে যে, তদানীন্তন কংগ্রেস মন্ত্রিসভার শেষ দিকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা বিরাট পুলিশ বাহিনী সঙ্গে না নিয়ে জনসভায় বা অন্যত্র যেতে সাহসই পেতেন না। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিসভাকে জনগণের চোখে আরও অপ্রিয় এবং অপদস্থ করে ফেলে ৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন। ব্যাপক খাদ্য সঙ্কটের ফলে জেলায় জেলায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভ প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিংসাত্মক চেহারাও নিয়েছিল সে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ গুলি চালালো অনেক জায়গায়। তাতে মানুষের প্রাণহানিও ঘটল। সাধারণ মানুষের যাবতীয় সহানুভূতি চলে গেল প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সরকারের ওপর থেকে। এর ওপর আবার বাঙালিকে 'কাঁচকলা খাওয়ার' পরামর্শ দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র সেন নিজেকে এবং তাঁর সরকারকে ভিলেনই বানিয়ে ফেললেন। কংগ্রেস সরকার সেই সময় কতখানি অপ্রিয় এবং ঘৃণিত হয়েছিল মানুষের চোখে, তা তখনকার একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এবং প্রদেশ কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি অতুল্য ঘোষকে ব্যঙ্গ করে পাড়ায় পাড়ায় তখন বেগুন ও কাঁচকলা লটকে দেওয়া হয়েছিল। এরই ভিতর আবার কংগ্রেস ভেঙে বাংলা কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল। অতুল্য ঘোষদের সঙ্গে বিরোধের ফলে অজয় মুখার্জীকে ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে অজয়বাবু গঠন করেন বাংলা কংগ্রেস। বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অজয়বাবুর বাংলা কংগ্রেসও আন্দোলনে নেমে পড়ে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সরকারের বিরুদ্ধে।

এই আন্দোলন চলতে চলতেই এসে পড়ল ৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী দুটি ফ্রন্ট লড়াই করতে ময়দানে নামল। একটি ফ্রন্টে রইল বাংলা কংগ্রেস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই), প্রজা সোশালিস্ট পার্টি, বলশেভিক পার্টি, গোর্খা লিগ, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং লোকসেবক সঙ্ঘ। অন্য ফ্রন্টটিতে রইল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল, আর সি পি আই, ওয়ার্কার্স পার্টি, এস ইউ সি এবং সংযুক্ত সোশালিস্ট পার্টি। ফল বেরলে দেখা গেল ২৮০ সদস্যের বিধানসভায় বিরোধীরা সব মিলিয়ে পেয়েছে ১৪০টি আসন। আর কংগ্রেস পেয়েছে ১২৭টি। বিরোধীদের ভিতর মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ৪৩, সি পি আই ১৬ এবং বাংলা কংগ্রেস ৩৪। অর্থাৎ জন্মলগ্নের তিন বছরের ভিতর নির্বাচনে অন্তত মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকেই বামপন্থীদের ভিতর থেকে বেশি গ্রহণ করল জনগণ। যাই হোক, নির্বাচনের পর এই দুই ফ্রন্ট মিলে গঠিত হল প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময়কার নানারকম ঘটনায় আর যাচ্ছি

না আমরা। অজয় মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী এবং জ্যোতি বসুকে উপমুখ্যমন্ত্রী করে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অকংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় বসল।

৬৭ সালে প্রথম অকংগ্রেসি-যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং তার দশ বছর পর ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় আনার পিছনে সাধারণ মানুষের একই মানসিকতা কাজ করেছিল। ৬৭ সালে যে মানসিকতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রথম অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছিল, ঠিক সেই মানসিকতা নিয়েই কিন্তু ৭৭ সালে ক্ষমতায় এনেছিল প্রথম বামপন্থী সরকারকে। ৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কুড়ি বছর এ রাজ্যে কংগ্রেসেকে একনাগাড়ে শাসন ক্ষমতা চালাতে দেখেছে জনগণ। এবং স্বাধীনতার পর একনাগাড়ে কুড়ি বছর রাজ্যের শাসন ক্ষমতা চালাতে গিয়ে, স্বাভাবিক কারণেই কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার গ্রাফও নিচের দিকে নেমেছে। জনগণের উর্ধ্বমুখী চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সব মেটাতে পারেনি কংগ্রেস। স্বাধীনতার পর তাই ক্রমশ কংগ্রেস সম্বন্ধে জনগণের মোহভঙ্গ ঘটেছে। পাশাপাশি এটাও দেখেছে মানুষ, স্বাধীনতার পর কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের চারদিকে ভীড় করেছে ক্ষমতালোভী মানুষের দল। ভূস্বামী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরা ভিড় বাড়িয়েছে কংগ্রেসে। এই কংগ্রেসকে দেখে মানুষের এই ধারণাই হয়েছে যে, কংগ্রেস সাধারণ মানুষের প্ল্যাটফর্ম নয়।

কংগ্রেসের সম্বন্ধে স্বাধীনতার পর এ রাজ্যের মানুষের এভাবে মোহভঙ্গ ঘটার পাশাপাশি ৬৫-৬৬-তে প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় খাদ্য আন্দোলনের মতো ঘটনা ঘটেছে। ওই খাদ্য আন্দোলনের ঘটনা আরও গভীরভাবে রেখাপাত করেছে সাধারণ মানুষের মনে। কংগ্রেসি নেতা এবং মন্ত্রীদের আচার-আচরণও সেই সময় মানুষকে আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। পাশাপাশি, বামপন্থীদের নিরন্তর এবং সুকৌশলী কংগ্রেস বিরোধী প্রচারও কংগ্রেস এবং তার নেতাদের সাধারণ মানুষের চোখে ভিলেন করে তুলেছে এই সময়।

কংগ্রেসের এই অবস্থার সঙ্গে বিচার করে দেখতে গেলে কিন্তু বামপন্থীরা সেই সময় অনেক সুবিধাজনক অবস্থাতেই ছিলেন। প্রথমত, কংগ্রেস স্বাধীনতার পরে ক্ষমতায় এসেছিল। এবং ক্ষমতায় এসে যেহেতু কেউ কখনই জনগণের সব আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারে না, কংগ্রেসও তা পারেনি। কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার গ্রাফ তাই ক্রমশই নিম্নমুখী হয়েছিল। স্বাধীনতার পর প্রথম কুড়ি বছর বামপন্থীরা কিন্তু ক্ষমতায় আসেনি। কাজেই ক্ষমতায় এসে ব্যর্থ হয়ে জনপ্রিয়তা হারানোর মত অসুবিধার মুখোমুখি তখনও তাদের হতে হয়নি। তারা বিরোধী আসনে ছিল। এবং বিরোধী আসনে থেকে সমালোচনা এবং আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার মত সুবিধাজনক জায়গাটিতেই তাদের অবস্থান ছিল।

এরই পাশাপাশি, কংগ্রেসের তুলনায় বামপন্থীদের সম্বন্ধে একটি অন্যরকম ধারণাও গড়ে উঠেছিল মানুষের মনে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের চারদিকে যখন ভূস্বামী, শিল্পপতি এবং বড় ব্যবসায়ী ভীড় জমালো, এবং সাধারণ মানুষের আস্থা ক্রমেই হারাতে থাকল কংগ্রেস সম্বন্ধে, ঠিক তখনই সাধারণ মানুষ বামপন্থীদের একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র কিন্তু লক্ষ্য করেছিল। সাধারণ মানুষ দেখলো, কংগ্রেসিদের ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বামপন্থীরা যাঁদের সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কোন নীতিহীনতা বা আদর্শভ্রষ্টতার অভিযোগ ওঠেনি। কংগ্রেসি নেতা এবং মন্ত্রীদের বিলাসী এবং বৈভবপূর্ণ জীবনযাত্রার তুলনায়

যাঁদের সাদামাটা জীবনযাপন তখন ছিল সাধারণ মানুষের চোখে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বিষয়।

এই কারণেই, ৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় যখন সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের বিকল্প কোনও একটি সরকারকে বেছে নেবার কথা ভাবলো, তখন কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্টগুলির কথাই ভাবলো তারা। কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে বামপন্থীদের ওপর প্রচণ্ড আশা-আকাঙ্খা রেখেই যুক্তফ্রন্টকে বিকল্প সরকার গড়ার সুযোগ তখন দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে, বিধানসভায় প্রাপ্ত আসনের নিরিখে কিন্তু তখন যুক্তফ্রন্টের চেয়ে কংগ্রেসের খুব একটা ফারাক ছিল না। কংগ্রেস পেয়েছিল ১২৭টি, আর যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিল ১৪০টি আসন। কিন্তু এভাবে বিচার করলে ভুল হবে। আসনের ফারাকটা খুব বেশি না হলেও, এর রাজনৈতিক এবং মানসিক প্রভাব পড়েছিল দুর্দান্ত। কুড়ি বছরের টানা কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে এ রাজ্যে প্রথম অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আগমন এটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল—স্বাধীনতার পর এখানে শাসনক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী কংগ্রেস ক্রমশই হারতে বসেছে।

এর ঠিক দশ বছর পর, ৭৭ সালে ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। বিচার করলে দেখা যাবে, ৬৭ সালে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় আনার পিছনে যে মানসিকতা কাজ করেছিল সাধারণ মানুষের, ৭৭ সালেও বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় আনার পিছনে সেই একই মানসিকতা সাধারণ মানুষের কাজ করেছিল। ৬৭ এবং ৬৯ সালে দু-দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মানুষ দেখেছিল বটে, কিন্তু তা খুবই স্বল্প সময়ের জন্যই দেখা। সাকুল্যে আড়াই বছরের ওই দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল দিয়ে বামপন্থীদের প্রশাসন ক্ষমতা যাচাই করতে পারেনি সাধারণ মানুষ। ৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের আগে যেমন খাদ্য আন্দোলনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত কংগ্রেস জনপ্রিয়তা প্রচণ্ডভাবেই হারিয়েছিল, তেমনি ৭৭-এর সাধারণ নির্বাচনের আগেও ৭২ থেকে ৭৭ পর্যন্ত কংগ্রেসি মন্ত্রিসভার কাজকর্মও ৭৭-এ তাদের পতনের কারণ হয়েছিল। ৭২ থেকে ৭৭ পর্যন্ত সময়ে কংগ্রেসে নিজেদের ভিতর চূড়ান্ত গোষ্ঠীবাজী, কংগ্রেসি মন্ত্রী-নেতাদের অবাধ দুর্নীতি, প্রশাসনিক কাজ চালানোয় চূড়ান্ত ব্যর্থতা, কংগ্রেসকে ঘিরে মস্তানরাজ গড়ে ওঠা, কংগ্রেসি নেতা-মন্ত্রিদের জনগণ থেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াই কংগ্রেসের পতনকে ডেকে এনেছিল। তার ওপর আবার এসেছিল জরুরি অবস্থার মত ঘটনা।

কাজেই ৭৭-এ সাধারণ নির্বাচন যখন উপস্থিত হল, তখন আবার জনগণের কাছে কংগ্রেসের বিকল্প বেছে নেবার প্রশ্ন দেখা দিল। এবং এক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই এবারও জনগণের সামনে ভেসে এলো বামপন্থীদের নাম। তখনও পর্যন্ত বামপন্থীদের চালচলন-আচার-আচরণ এবং নীতি ও আদর্শবোধ তাঁদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে শ্রদ্ধাশীলই রেখেছিল। সেই শ্রদ্ধার জায়গা থেকেই কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বামপন্থীদের প্রতিষ্ঠিত হতে সুযোগ করে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ।

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, ৬৭ এবং ৭৭-এ যুক্তফ্রন্ট এবং বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠার পিছনে জনগণের অসীম আশা-আকাঙ্খা ছিল। জনগণ ভেবেছিল এই যুক্তফ্রন্ট এবং

বামফ্রন্ট সরকার হবে তাদেরই সরকার। তাদের হাসি কান্না, সুখ দুঃখের শরিক হবে এই সরকারগুলি।

যুক্তফ্রন্ট এবং বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পিছনে আরও কয়েকটি কারণ আছে। এই কারণগুলির ভিতর একটি বড়ো কারণ হল, দেশবিভাগ। ৪৭ সালে দেশবিভাগের একটা বড়ো ধাক্কা পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে যাঁরা চলে এসেছিলেন এপার বাংলায়, তাঁরা তাঁদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করেছিলেন কংগ্রেসকে। তাঁদের ভিতর কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তিকে বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো বামপন্থীরা। ৬৭ এবং ৭৭ দুবারই ওপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা এই পরিবারগুলির বিপুল জনসমর্থন পেয়েছিল বামপন্থীরা।

যে আশা-আকাঙ্খা নিয়ে জনগণ যুক্তফ্রন্ট এবং বামফ্রন্ট সরকারকে বসিয়েছিল ক্ষমতায়, কার্যত দেখা গেছে জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণে সেই সরকারগুলি ব্যর্থই হয়েছে। কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে ৬৭ এবং ৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু তারা ক্ষমতায় আসার পর জনগণ দেখলো, জনগণের দিকে চেয়ে দেখার সময় এবং সুযোগ কোনটাই এদের নেই। নিজেদের সমস্যা নিয়েই এরা বেশি ব্যস্ত। শরিকি সংঘর্ষ, ফ্রন্ট শরিকদের ভিতর কোন্দল, চূড়ান্ত মতের অমিল, রাজনৈতিক খুনোখুনি, সর্বোপরি নকশালবাড়ি আন্দোলনের উদ্ভব দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধেই হতাশ করে ছেড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে। তা সত্ত্বেও, ৭৭ সালে তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার সুযোগ পেল বামপন্থীরা। ৭৭ থেকে ৮২ প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম নিয়ে কিন্তু জনগণের ক্ষোভ নেই, অভিযোগও নেই। বলতে গেলে বামফ্রন্ট সরকার তাদের প্রথম পাঁচ বছরই একমাত্র প্রকৃত জনগণের সরকার হিসেবে কাজ করেছে। ৭৮-এ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা, গ্রামোন্নয়ন, ভূমি সংস্কার—প্রথম এই পাঁচ বছরে যেভাবে সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করেছে বামফ্রন্ট তা তার পরের বছরগুলিতে পারেনি, বা করতে চায়নি। ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার সতের বছর পর, এই ৯৪ সালে, বামফ্রন্ট সরকারের সেই চেহারাটাই আমূল বদলে গেছে। সতের বছর পর জনগণ এখন দেখছেন, প্রোমোটার-ব্যবসায়ী-শিল্পপতি প্রমুখ ক্ষমতাভোগী ব্যক্তিরা গিয়ে ভীড় করছেন বামফ্রন্টের আশেপাশে। তাদের সঙ্গেই গড়ে উঠছে বামফ্রন্টের নেতা-মন্ত্রীদের হৃদ্যতার সম্পর্ক। প্রশাসন দুর্নীতি আরও গেড়ে বসছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। পুলিশ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া কাজ করছে না। বামপন্থী দলগুলির ছত্রছায়াতে গিয়ে ভীড় জমাচ্ছে মস্তান-সমাজবিরোধীরা। বামপন্থী নেতা-মন্ত্রীদের গর্ব করার মতো চরিত্র এবং আচার-আচরণ নিয়েও আজ প্রশ্ন জাগছে। সাট্টা ডনদের সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতাদের যোগাযোগ এখন প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। কমিউনিস্ট নেতারা গা ভাসিয়েছেন বৈভবে-বিলাসে। কমিউনিস্ট নেতাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনরা বিভিন্ন অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করছেন। জনগণের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁরা হচ্ছেন দাম্ভিক।

এই টানা সতের বছরের বাম শাসনে জনগণ এও লক্ষ্য করেছেন, নীতি এবং আদর্শ থেকে শত যোজন মাইল দূরে সরে এসেছেন বামপন্থীরা। এই বামপন্থী জমানাতেই শ্রমিক আন্দোলনে গুলি চলেছে, গুলি চলেছে কৃষক আন্দোলনে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের আন্দোলনেও গুলি চলেছে। রাজ্যের উন্নতি এক আঙুলও হয়নি। ভয়াবহ হয়েছে রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতি। একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। ছাঁটাই হয়েছেন

হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। কাজের সুযোগ গড়ে তোলা যায়নি। বেকারি বেড়েছে, বেড়েছে অভাব। জনগণের সবকটি চাহিদা পূরণেই চূড়ান্ত গাফিলতি দেখিয়েছে বামপন্থীদের সরকার। তবু, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নানারকম জাল জুয়াচুরি এবং ছলনার আশ্রয় নিয়েছে তারা।

যে স্বপ্ন এবং বিপুল আশা-আকাঙ্খার ওপর ভর করে ৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সে স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ঘা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সতের বছরে। কাজেই এই সতের বছরের ইতিহাস স্বপ্নভঙ্গেরই ইতিহাস। বামফ্রন্ট সম্বন্ধে মানুষ যে কতখানি হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন—একটি সাধারণ উদাহরণ দিলেই তা বোঝানো যাবে। বাঙালির চোখে জ্যোতি বসু একসময় ছিলেন হিরো। বাঙালি ভাবতো বিধানচন্দ্র রায়ের পর জ্যোতি বসুই পারেন পশ্চিমবঙ্গকে যথাযোগ্য নেতৃত্ব দিতে। কিন্তু সতের বছর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার পর জনগণ কী ভাবেন? একটু কান পাতলে এখন কিন্তু রাস্তায় ঘাটে-বাসে ট্রামে জ্যোতি বসু সম্বন্ধে নানারকম ঠাট্টা-মশকরা শুনতে পাবেন। শুধু জ্যোতি বসু কেন। যে বামপন্থী নেতাদের সম্বন্ধে একসময় শ্রদ্ধাশীল ছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, সেই তাঁদের সম্বন্ধেও শোনা যাবে নানারকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ। এর থেকে এটাই বোঝা যায়, জ্যোতি বসু বা বামপন্থী নেতারা এখন আর আগের ওই শ্রদ্ধার আসনটিতে নেই। বামপন্থীদের সম্বন্ধে স্বপ্ন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভঙ্গ হয়েছে।

এই স্বপ্নভঙ্গের বিস্তারিত কাহিনী পরে আমরা আলোচনা করব। তার আগে ৬৭ এবং ৬৯ সালে দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলগুলি একটু তাকিয়ে দেখি আমরা।

৬৭ সালে চোদ্দ দলের যুক্তফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করেই ঘোষণা করল, রাজ্যের মন্ত্রিদের নিরাপত্তার জন্য আর পুলিশের দরকার নেই। মুখ্যমন্ত্রীর মাইনে এই নতুন সরকার মাসিক ১,১৫০ টাকা থেকে কমিয়ে ৭০০ টাকা করে দিল। অন্যান্য মন্ত্রীদের মাইনে ৯০০ টাকা থেকে কমিয়ে করা হল ৫০০ টাকা। মহাকরণের ঘরে ঘরে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী একহাজার টাকা মাইনে পেলে, অন্য মন্ত্রীরা ৯০০ টাকা মাইনে পেলে বা মন্ত্রীদের ঘরে ঘরে শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র চালু থাকলেই যে তাঁরা বুর্জোয়া, জনগণের শত্রু এমন ভাবার কোনও কারণ ছিল না। তবু প্রথম ক্ষমতায় আসার উন্মাদনায় এবং জনগণের কাছে নিজেদের বিপ্লবী প্রমাণ করার ঝোঁকে এই সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করে বসল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। রাজনৈতিক বিচারে কিন্তু প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই সিদ্ধান্তগুলি নিতান্তই রোমান্টিক সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্ষমতায় এসে যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদের আঠারো দফা কর্মসূচী পেশ করল জনগণের সামনে। এই কর্মসূচীর ভিতর প্রথমেই ছিল ভূমি সংস্কারের কথা।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম শুরু হয়েছিল কিন্তু গণমুখী চিন্তা নিয়েই। যেমন, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কার্যভার গ্রহণ্ করেই কলকাতা পুরসভাকে নির্দেশ দিল বস্তির ওপর কর কমিয়ে বহুতল বাড়ির ওপর কর বাড়াতে। পুলিশের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হলো ৪০ লক্ষ টাকা। কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হল, শ্রমিক আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ব্যবহার বরদাস্ত করা হবে। শ্রমিক আন্দোলনের খবর পেলে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তা রাজ্যের শ্রম দপ্তরে

জানাতে হবে। বলাই বাহুল্য, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের এইসব পদক্ষেপগুলি ছিল খুবই পপুলার পদক্ষেপ। এইসব পদক্ষেপের পক্ষে জনসমর্থন আদায় করাও খুব একটা কঠিন ছিল না। বিশেষ করে যখন আগের শাসকদের এইরকম পপুলার পদক্ষেপ নিতে দেখেননি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আর এইসব পপুলার পদক্ষেপগুলিকে কেন্দ্র করে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ঘিরে তৈরি হল এক উন্মাদনা, এক নতুন রোমান্টিক আবেগ। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ভাবতে শুরু করল যে, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার আমজনতারই সরকার।

অবশ্য এইসব চটজলদি পপুলার পদক্ষেপের পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাত দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার। যা পরে তাদের এবং আরও পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্টের বড়ো মূলধন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা হল ভূমি সংস্কার।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা। রাজ্যের কৃষক আন্দোলনের অগ্রগণ্য চরিত্র। ভূমি সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে হরেকৃষ্ণবাবু বললেন, 'প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বিপুল পরিমাণে জমি বেনামে যেভাবে দখল করে রাখা হয়েছে—তা উদ্ধার করা। তারপর তা ভূমিহীনদের ভিতর বিলি বণ্টন করা। সরকারের দায়িত্ব হল বর্গাদারি প্রথার কুফল সম্বন্ধে গরিব ভূমিহীন কৃষকদের সচেতন করা। এবং তাদের সমবায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থায় আগ্রহী করে তোলা।'

এটা ঠিকই যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদার, ভাগচাষী গরিব কৃষকদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। শোষণ এবং লাঞ্ছনাই ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। এক অদ্ভুত প্রাচীন শোষণ ব্যবস্থা বহাল ছিল গ্রামে গ্রামে। ব্যবস্থাটা এরকমই ছিল যে, জোতদার বা জমিদাররা বর্গাদার বা ভাগচাষীদের সঙ্গে ফসল বণ্টনের একটি লোকদেখানো চুক্তিতে আবদ্ধ হত। এক্ষেত্রে দুরকম চুক্তি হত। এক, যদি জোতদার বা জমিদার তার জমিতে চাষের জন্য হাল-বলদ, সার ইত্যাদি সবই দিত, তাহলে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকটি পেত সেই জোতদার বা জমিদার। বাকি অর্ধেক পাবার অধিকারী হত ভাগচাষী। আর যদি হাল-বলদ কিছুই না দিয়ে, শুধু চাষের জন্য জমিটি দেওয়া হত, তাহলে উৎপাদিত ফসলের চল্লিশ শতাংশ পেত জোতদার বা জমিদার। বাকিটুকু ভাগচাষী। কিন্তু এ চুক্তি নিতান্তই খাতায়-কলমে চুক্তি মাত্র। এই চুক্তির নাম করে গরিব ভাগচাষীদের ঠকিয়ে নিয়ে চলতো অবাধ শোষণ। কোনও নিরাপত্তাই ছিল না ভাগচাষীদের। তার ওপর গ্রামের এই জোতদার-জমিদারদের ছিল নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনী। থানা-পুলিশের সঙ্গেও দহরম-মহরম ছিল তাদের। ফলে অবাধ শোষণ চালাতে কোনও অসুবিধাই ছিল না। বেনামে জমির পর জমি দখল করে রাখত এই জোতদার-জমিদাররা।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার কিন্তু গ্রামে এই প্রাচীন শোষণ ব্যবস্থা বন্ধ করেনি, করতেও চায়নি। বরং, যে ভূস্বামীরা এই শোষণ ব্যবস্থা চালাতো সেই ভূস্বামীরাই ঢুকে বসেছিল কংগ্রেসে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে যখনই এই শোষণ ব্যবস্থা নির্মূল করার কথা বললো, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ রাজনীতির চালচিত্রটি কিন্তু সেই সময় থেকেই বদলাতে লাগল। থানা-পুলিশের আশীবাদ ধন্য এই ভূস্বামীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধেও যে রুখে দাঁড়ানো যায়, গ্রামের গরিব কৃষকরা সেই প্রথম বুঝলো। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে যুক্তফ্রন্ট, বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলি সফল হল তাদের

সংগঠনের শিকড় নামিয়ে দিতে। ভাগচাষী, বর্গাদারদের ভিতর শক্ত এবং মজবুত সংগঠন গড়ে উঠল বামপন্থীদের। যার সুফল এখনও অবধি লাভ করছে বামফ্রন্ট সরকার।

এবার এই ভূস্বামীদের রাজনৈতিক অবস্থানটা দেখা যাক। স্বাধীনতার পর থেকে ৭৭ সাল অবধি এই ভূস্বামীরা কংগ্রেসেরই সমর্থক ছিল। গ্রামাঞ্চলে তাদের এই অবাধ শোষণে কংগ্রেস কোনও হস্তক্ষেপ করেনি, উল্টে কংগ্রেস সরকারের পুলিশ-প্রশাসন কার্যত তাদের পক্ষেই ছিল—কাজেই কংগ্রেসকে সমর্থন না করার কোনও কারণ ছিল না তাদের পক্ষে। উল্টে বামপন্থীদের সম্বন্ধে তাদের বরাবর ছিল চূড়ান্ত ঘৃণা এবং অবিশ্বাস। যে ভাগচাষী এবং গরিব কৃষকদের ওপর এই শোষণের বন্দোবস্ত কায়েম করে রেখেছিল এই ভূস্বামীরা, সেই ভাগচাষীদের সংগঠিত করে বামপন্থীরা এই ব্যবস্থায় আঘাত হানতে চায় এমন আশঙ্কা ভূস্বামীদের ছিলই। তার ওপর যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে জমি দখল অভিযান বামপন্থীদের সম্বন্ধে আরও ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল ভূস্বামীদের মনে। এর ওপর আরও একটি কারণ ছিল। গ্রামীন সমাজ, নানারকম অনুশাসনে দাবিয়ে রাখা হত যে শ্রেণীকে, যে শ্রেণী ভূস্বামীদের সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলবে কেউ ভাবেনি কোনওদিন, যে শ্রেণীকে বেগার পরিশ্রম দিতে হত ভূস্বামীর বাড়িতে সেই শ্রেণীই যখন সংগঠিত হয়ে কথা বলতে শুরু করল, তখন মানসিকভাবেই ভূস্বামীরা তা মেনে নিতে পারল না। তাদের ঠুনকো অহংবোধে ঘা লাগলো এতে। আর এই নিচুতলাকে এভাবে সংগঠিত করার জন্য ভূস্বামীদের যাবতীয় ঘৃণাটুকু গিয়ে পড়ল মার্ক্সবাদীদের ওপরই।

৭৭ সালে মার্ক্সবাদীদের সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত কিন্তু এই ঘৃণার সম্পর্কই ভূস্বামীদের সঙ্গে মার্ক্সবাদীদের বজায় ছিল। ৭৭ সালে যখন প্রথম মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় এলো, তখনও কিন্তু তাদের সরকারকে ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের চোখেই দেখেছিল ভূস্বামীরা। তাদের ভয় ছিল, আবার বুঝি মার্ক্সবাদীদের নতুন সরকার ৬৭-র যুক্তফ্রন্ট সরকারের মতোই জমি দখলের ডাক দেয়। কিন্তু ৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মতো জমি দখলের ডাক ৭৭ সালে মার্ক্সবাদীরা দেননি। বরং, গ্রামাঞ্চলে যে সাংগঠনিক ভিত্তিটি তৈরি হয়েছে, তাকে আরও মজবুত করতেই মার্ক্সবাদীরা এবার প্রথম থেকেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এবং একাজ করতে গিয়ে ৬৭ সালে জমি দখলের মতো নিছক রোমাণ্টিকতার দিকে না ঝুঁকে ৭৭ সালে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গণমুখী এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন মার্ক্সবাদীরা।

৭৭ থেকে ৮২ মার্ক্সবাদী সরকারের এই প্রথম পাঁচবছর কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সত্যিই কিছু উন্নতি ঘটল। গ্রামীণ অর্থনীতিতেও কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারলেন মার্ক্সবাদীরা। শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিও ঘটলো। গ্রামে চিরাচরিত শোষণ ব্যবস্থাও বন্ধ হল অনেকটাই। মহাজনদের কাজ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নেওয়া বন্ধ করতে সমবায় ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা হল গ্রামে গ্রামে। ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা হল ভাগচাষী-বর্গাদারদের। পঞ্চায়েতের নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামের নিচুতলার মানুষের হাতে কিছু ক্ষমতাও গেল।

প্রথম দিকে তাঁদের সম্বন্ধে ঘৃণা এবং সংশয় থাকলেও, ভূস্বামীরা কিছুদিন পরেই ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন মার্ক্সবাদীদের ভয় করার আর কিছুই নেই। বিশেষ করে, ক্ষমতায় থাকার প্রথম পাঁচবছর কেটে যাবার পর যখনই ক্রমে ক্রমে নানারকম স্বার্থান্বেষী

চক্র মাথা চাড়া দিতে লাগল, তখনই ভূস্বামীরা বুঝতে পারলেন তাঁদের স্বার্থের কাজেও মার্ক্সবাদীরা লাগবেন। আর এটা বুঝতে পারার পরই ভূস্বামীরাও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে এগিয়ে এলেন। নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য গায়ের জামার রঙও বদলে ফেললেন তাঁরা। মার্ক্সবাদীরাও বিপ্লব করতে আসেননি। তাঁরাও দেখলেন, ক্ষমতায় থাকার সবথেকে ভালো উপায় হচ্ছে, সবাইকে কিছু পাইয়ে দিয়ে নিজেদের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা। ফলে পার্টিতে জোতদার-ভূস্বামীদের ঢুকে পড়তেও বাঁধা রইল না। যে লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে মার্ক্সবাদীরা কাজকর্ম শুরু করেছিল, সে লক্ষ্যটাই গেল হারিয়ে। জামা পালটিয়ে পার্টিতে ঢুকে যাওয়া জোতদার-ভূস্বামী, নতুন স্বার্থান্বেষী চক্র, এদের ভিড়ে ভাগচাষী-বর্গাদাররা কিন্তু নিতান্তই মিছিলের মানুষই হয়ে রইল।

যাই হোক, ৬৭ সালের ঘটনায় 'আবার কিছুটা পিছিয়ে যাই। ৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভূমিসংস্কারের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভূমি সংস্কার করতে গিয়ে সে সময় নিছক রোমান্টিকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন যুক্তফ্রন্টের নেতা-মন্ত্রীরা। তাঁর যে কোনও বিপ্লব করে ক্ষমতায় আসেননি, এসেছেন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন লড়ে—সেটাই বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন তাঁরা। ভূমি সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা তাই প্রথমেই বলেছিলেন, গায়ের জোরে বেনামি জমি দখল কর। আর এই কাজ করতে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তার ক্যাডারদের মাঠে নামিয়ে দিয়েছিল। দলে দলে ক্যাডাররা লাল-রুমাল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গ্রামে-গঞ্জে। জমি দখল করে পুঁতে দেওয়া হতে লাগল লালঝাণ্ডা। চর্তুদিকে এক চূড়ান্ত ডামাডোল তৈরি হল। তৈরি হল এক চূড়ান্ত অরাজক অবস্থা। জন্ম নিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। ভুল পথে গিয়ে সে আন্দোলন রূপ নিল চূড়ান্ত নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের। খুনের রাজনীতি কায়েম হয়ে বসল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। নিজেদের ভুল পদক্ষেপে এই খুনের রাজনীতির বীজটি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বপন করে দিয়ে গেল যুক্তফ্রন্ট সরকারই।

চার

৬৭ সালে সরকারটা পাল্টেছিল শুধু। কিন্তু বিপ্লবের মাধ্যমে এই সরকারে পরিবর্তন আসেনি একথা আগেই বলেছি। এবং এই সরকারে কমিউনিস্ট শরিক থাকলেও, সরকারে ছিল এমন অনেক শক্তি, যারা আদৌ বামপন্থী বা বিপ্লবী ছিলেন না। বরং কংগ্রেস বিরোধিতা করে ক্ষমতায় আসার লক্ষ্যে এরা বামপন্থীদের সঙ্গে নির্বাচনী গাঁটছাড়া বেঁধেছিলেন মাত্র। বামপন্থীদের বদলে সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প অন্য কোনও শক্তি যদি থাকত, তাহলে এরা তার সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধতেন। বামপন্থীরা কিন্তু প্রথম ক্ষমতায় এসে এসব বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করল না। তারা ভাবল, সরকারে আসা মানে আদিঅন্তকাল শাসন ক্ষমতা তাদের কব্জায় এসে গেল। এবং এই ভাব থেকেই অতি বাম রোমান্টিকতায় তারা ক্যাডার নামিয়ে গায়ের জোরে জমি দখলের ডাক দিল। এই গায়ের জোরে জমি দখলের ডাক দেওয়াটাই বাম রাজনীতির মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ ছিল। এর দশবছর পর ৭৭ সালে ক্ষমতায় ফিরে এসে ৬৭-র সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই আর অতি বাম রোমান্টিকতা সম্পন্ন ভুলগুলো

আর করেনি বামফ্রন্ট। বরং, বামফ্রন্ট অনেক সংযত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে শিখেছে।

নকশালবাড়ি ভারত-নেপাল সীমান্তে আদিবাসী অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন প্রথম ক্ষমতায় আসে, তখন, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দার্জিলিং জেলার পরিচিত নেতা ছিলেন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু। নকশালবাড়ি অঞ্চলে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার কৃষক সংগঠনের নেতা ছিলেন জঙ্গল সাঁওতাল। এই নেতারা বেনামি জমি উদ্ধারের জন্য জঙ্গী পথেই দ্রুত অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ততে বহাল ছিলেন। এবং এঁরা বেনামী জমি জঙ্গীপথে দ্রুত উদ্ধারের জন্য নকশালবাড়ি এলাকায় আদিবাসি কৃষক সমাজকেও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার ৬৭-র মার্চ মাসে ক্ষমতায় আসার পরই ২০ থেকে ২২ মে নকশালবাড়ি এলাকায় প্রসাদ জোতের বেনামি জমি মিছিল করে দখল নিয়ে নেয় স্থানীয় কৃষকরা। কিন্তু যেই জোতদারদের জমি জোর করে দখল নিয়ে নেওয়া হয়, তাঁরা আবার ছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির ঘনিষ্ঠ। এই জোতদাররা অজয় মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ নামলো কৃষকদের বাধা দিতে। ২২ থেকে ২৫ মে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে কৃষকদের তুমুল সংঘর্ষ হল। কৃষকদের তীরের আঘাতে সোনম ওয়াংদি নামে পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর নিহত হলেন। আহত হলেন পুলিশ বাহিনীর আরও অনেকে। ক্ষিপ্ত অজয় মুখার্জি হুমকি দিলেন, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যদি এভাবে জমি উদ্ধার বন্ধ না করে, তাহলে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেবেন। ইতিমধ্যে পুলিশ প্রসাদ জোতের কৃষকদের ওপর হামলা আরও বাড়িয়ে দিল। দশজন আদিবাসী কৃষক রমণী খুন হলেন পুলিশের হাতে।

এটা ঠিক যে, অতি বাম রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে এবং বাস্তব বিবেচনা না করে গায়ের জোরে জমি দখলের ডাক দিয়ে রাজনৈতিক ভাবে সে সময় মারাত্মক ভুলই করেছিল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। এই ভুলের মাশুল পরে যেমন তাদের গুণতে হয়েছে, তেমনই তাদের এই ভুলেই পশ্চিমবঙ্গে খুন, জখম এবং সন্ত্রাসের রাজনীতি জন্ম নিয়েছিল। তেমনই, পাশাপাশি একথাও ঠিক প্রসাদ জোতের ওই গরিব কৃষকদের সংগ্রামকেও কিন্তু অবজ্ঞা, অবহেলা বা অশ্রদ্ধা করলে চলবে না। দিনের পর দিন শোষিত এবং নিপীড়িত হতে হতে এক মহান লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু তাঁরা লড়াইয়ে নেমেছিলেন। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে চালিয়েছিলেন এক সাহসী লড়াই। বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাসে নকশালবাড়ির সেদিনের সেই সংগ্রাম কিন্তু স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকবে চিরকাল।

সে যাই হোক, অজয় মুখার্জির ওইভাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার হুমকির পরই কিন্তু দেখা গেল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় এবং রাজ্য নেতারা আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন। মুহূর্তে তাদের মাথা থেকে বিপ্লবের চিন্তা ছেড়ে গেল। নকশালবাড়ির পথে আন্দোলনের বদলে বরং সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতায় টিকে থাকাকেই তখন বেশি জরুরি মনে করলেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। অতএব, নকশালবাড়ির আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসার বদলে বরং রাজ্য পার্টি থেকে শিলিগুড়ির পার্টি নেতাদের কাছে খবর গেল, এই ধরনের কাজ থেকে কমরেডদের নিবৃত্ত করতে হবে। তাঁদের এই ধরনের কাজ করা থেকে থামাতে হবে এবং নকশালবাড়ির বেনামি

জমি উদ্ধারের সংগ্রাম স্থগিত রাখতে হবে। যুক্তফ্রন্ট সিদ্ধান্ত নিল, ফন্ট্রের পক্ষ থেকে কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে একটি কমিশন সরজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাবেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিশ্বনাথ মুখার্জি এবং সুশীল ধারাকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হল। কমিশন ঘটনাস্থলেও গেল। হরেকৃষ্ণ কোঙার শিলিগুড়িতে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকাল কমিটির বর্ধিত বৈঠকে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করার প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন। কিন্তু লোকাল কমিটির বর্ধিত সভায় হরেকৃষ্ণ কোঙারের ওই মতামত প্রত্যাখ্যান করা হল। লক্ষ্য করে দেখুন, মন্ত্রিসভা ভেঙে যাওয়ার হুঙ্কারেই যেন কেমন সুর পাল্টে গিয়েছিল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য নেতাদের। তিন মন্ত্রীর মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো কলকাতায়। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব শিলিগুড়ি এবং নকশালবাড়ির সংশ্লিষ্ট দলীয় নেতা এবং কর্মীদের দল থেকে বহিষ্কার করল। বহিষ্কার হলেন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল এবং সৌরেন বসু। যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ঝাণ্ডা পুঁতে বেনামি জমি দখলের ডাক দিয়েছিল, সেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে গড়া যুক্তফ্রন্ট সরকারই এবার নকশালবাড়ির আন্দোলন থামাতে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা নিল। নকশালবাড়িতে পুলিশি দমন-পীড়ন উঠলো চরমে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এই পুলিশি দমনকে সমর্থন জানালেন। যদিও গোড়ায় গলদটা তাঁরাই করেছিলেন। এরই ভিতর আবার চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন জানিয়ে বসল নকশাল বাড়ির এই আন্দোলনকে।

মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে আবার ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়ল। যদিও সরকারিভাবে সি পি আই (এম এল) জন্ম নিয়েছিল ১৯৬৯ সালের মে মাসে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়িতে ওই কৃষক আন্দোলন এবং তাকে দমন করতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশি ব্যবস্থা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে মতদ্বৈধতার জন্ম দিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং তার শরিক মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের প্রতি অভিযোগের আঙুল তুললেন নকশালবাড়ির সমর্থকরা। তাঁরা বললেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বিপ্লবের পথ ছেড়ে সংশোধনবাদের পথে চলেছেন। মার্ক্সবাদী চিন্তাসম্পন্ন তরুণ এবং যুবকদের এক বিশাল অংশকে প্রভাবিত করল নকশালবাড়ির এই আন্দোলন। পার্টি সরকারিভাবে ভাগ হল না বটে, কিন্তু কার্যত আলাদাই হয়ে গেল দুই মতাবলম্বীরা। ১৯৬৭-র ২৮ জুন তারিখে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকদের সঙ্গে এই বিরোধী মতাবলম্বীদের প্রথম সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটল এই কলকাতাতেই। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দেশহিতৈষী কে দখলে রাখবে তা নিয়েই সংঘর্ষ। কিন্তু ভবিষ্যতের অগ্নিগর্ভ দিনগুলির সূচনা করে দিয়ে গেল সেই সংঘর্ষ।

একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। ৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার সময় যে যে জিনিসগুলি কাজ করেছিল তার ভিতর একটি হচ্ছে, পার্টি সংশোধনবাদীদের খপ্পড়ে চলে যাচ্ছে। ডাঙ্গে, রাজেশ্বর রাও, ভূপেশ গুপ্তদের বিরুদ্ধে তখন সংশোধনবাদীদের খপ্পড়ে পড়ে যাবার অভিযোগই তোলা হয়েছিল বেশি করে। শুধু তাই নয়। ডাঙ্গে, রাজেশ্বর রাও, ভূপেশ গুপ্তরা বিপ্লবের পথ ছেড়ে ক্রমশই নির্বাচনী মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন এই অভিযোগও তোলা হয়েছিল। যাঁরা এই অভিযোগগুলি তুলেছিলেন সেই সময়, তাঁরা তখন পার্টিতে চীনাপন্থী বলে পরিচিত হয়েছিলেন। পরে এঁরাই কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে বেরিয়ে এসে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন করেন। আবার ৬৭

সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন এ রাজ্যে ক্ষমতা এলো, তখন নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরেও এই একই অভিযোগ উঠল। ডাঙ্গে, রাজেশ্বর রাও বা ভূপেশ গুপ্ত নন—বরং ওঁদের সঙ্গে মতবিরোধ করে যাঁরা দল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই প্রমোদ দাশগুপ্ত, মুজফ্‌ফর আহমেদদের বিরুদ্ধেই সংশোধনবাদী বনে যাবার অভিযোগ উঠল। এবং এবার যাঁরা প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং মুজফফর আহমেদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন—তাঁরা চীনাপন্থী বলে পরিচিত হলেন পার্টিতে। দুটি ঘটনা মিলিয়ে দেখলে চট করে একটি সত্যিই পরিষ্কার হয়ে আসে আমাদের সামনে। তা হল, কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের চরিত্র বদলে যাওয়া সম্পর্কে খোদ পার্টির ভিতর থেকেই বারেবারে অভিযোগ উঠেছে। কাজেই, কমিউনিস্ট নেতাদের চরিত্র বদলে নতুনত্ব আর কিছুই নেই।

আগেই বলেছি, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় আনার পিছনে পশ্চিমবাংলার মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্খা ছিল। মানুষের এরকমই ধারণা ছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকার এক জনমুখী নতুন শাসন ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারবে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এর নেতৃত্বের অভাব ছিল প্রকট। ৬৭ এবং ৬৯ সালে দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারকেই নেতৃত্ব দিতে ডেকে আনা হয়েছিল বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জিকে। কিন্তু, কেমন ছিল অজয় মুখার্জির নেতৃত্ব? এই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ই জিওফ্রে মুরহাউস নামে এক বৃটিশ নাগরিক কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন। কথা বলেছিলেন মন্ত্রী এবং রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও। এই রাজনৈতিক নেতাদের ভিতর ছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি। মুরহাউস দেশে ফিরে গিয়ে কলকাতা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখেছেন। সে বইয়ে অজয় মুখার্জি সম্বন্ধে মুরহাউস লিখেছেন, একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অজয় মুখার্জি অন্তত আধঘণ্টা সময় নেন। এবং যখন উত্তর দেন, তখন আসল উত্তরের ধারকাছ দিয়েও তাঁর উত্তর আসে না। অজয় মুখার্জি ভালো মানুষ ছিলেন, সৎ মানুষ ছিলেন ঠিকই। কিন্তু একটি সরকারকে নেতৃত্ব দেবার জন্য যে ব্যক্তিত্বের দরকার, যে ব্যক্তিত্ব দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সরকারকে, তা অজয় মুখার্জির ছিল না। অজয় মুখার্জির এই ব্যক্তিত্বহীনতাই মুরহাউসের চোখে ধরা পড়েছিল। সরকারের প্রধানের এই ব্যক্তিত্বহীনতার জন্যই কিন্তু সরকার দানা বাঁধতে পারেনি। নানারকম শক্তি সরকারের ভিতর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, এবং ব্যক্তিত্বহীনতার জন্য তাদের কাউকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি অজয় মুখার্জি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে ব্যক্তিত্ব নিয়ে কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বা গত সতের বছর যে ব্যক্তিত্ব নিয়ে জ্যোতি বসু বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আছেন—তা দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির কখনই ছিল না।

নেতৃত্বের এই অভাব, তারই পাশাপাশি ৬৭ এবং ৬৯ সালের দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারেরই প্রশাসনের কালে বাস্তবমুখী চিন্তাধারার অভাব-দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারকেই কার্যত ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন করেছিল। এর ওপর আবার ছিল ফ্রন্ট শরিকদের শরিকি কোন্দল। সব মিলিয়ে দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই সৃষ্টি হয়েছিল চূড়ান্ত অরাজক অবস্থা। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দেখার পর সাধারণ মানুষ তাই বিরক্তই হয়েছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং ফ্রন্টের নেতাদের বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবেই দুটি ফ্রন্ট

সরকারের আমলেই এ রাজ্যে শিল্পচিত্রটি করুণ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেছিল, কোনও প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের ঘেরাও বা অবরোধ হঠাতে পুলিশ যাবে না। শ্রম দপ্তর নির্দেশ দিলেই তবে পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারবে। আরও একধাপ এগিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জি বলে বসলেন, 'মালিক এবং কর্মচারীদের ভিতর একটি দ্বৈরথের ব্যবস্থা আমি করেছি এবং ওই দ্বৈরথ থেকে পুলিশকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবার দেখা যাক কার শক্তি বেশি।' যুক্তফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্ত এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীর এই ঘোষণায় রাজ্যব্যাপী শুরু হয়ে গেল এক জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন। একটার পর একটা কল-কারখানায় শুরু হয়ে গেল ঘেরাও এবং ধর্মঘট। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নায্য দাবি-দাওয়া থাকলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনায্য দাবি-দাওয়া কাজ করতে শুরু করল এই ঘেরাও-এর পিছনে। কোথাও কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে চাপ দেওয়া হল, কোথাও স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণকারীদের কাজে ফিরিয়ে নেবার জন্য চাপ দিতে থাকা হল। ঘেরাও আন্দোলনগুলি মারমুখী রূপ নিতে থাকল। অধিকাংশ কলকারখানাই হয়ে পড়তে লাগল অচল এবং স্তব্ধ। ৬৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসেছিল, আর ওই বছরের সেপ্টেম্বরের ভিতরই ১,০১৬টি ঘেরাও-এর ঘটনা ঘটল। এই জঙ্গী আন্দোলন এবং অন্যান্য দাবি দাওয়ার চাপে পড়ে শিল্পপতিরাও আশঙ্কিত এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থা হারালেন তাঁরা। শিল্পপতি মহলে এই ধারণাই তৈরি হল যে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পস্থাপন করতে এলেই অবাঞ্ছিত গণ্ডগোলের ভিতর পড়তে হবে। ফলে, শিল্প বিনিয়োগের পরিমাণ কমতে লাগল। পুঁজি চলে যেতে শুরু করল অন্য রাজ্যে। ৬৭ থেকে ৬৯ পর্যন্ত রাজ্যের শিল্পচিত্রটি কী রকম করুণ হয়ে উঠেছিল? ৬৯ সালের আগস্ট মাসে চট শিল্পে আটদিনের ধর্মঘট হয়েছিল। এবং তার ফলে বিদেশি মুদ্রায় প্রায় চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হয়েছিল। ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে চা বাগানগুলোতে এক পক্ষকালের ধর্মঘট হয়েছিল। আর এর ফলে প্রায় ১৪ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশি মুদ্রা অর্জন করা যায়নি। ১৯৬৭ সালে শ্রমবিরোধের সংখ্যা ছিল ৪৩৮। ১,৬৫,০০০ শ্রমিকের ভাগ্য জড়িয়ে পড়েছিল এই বিরোধে। এবং এর ফলে সারা বছরে ৫০ লক্ষ শ্রমঘণ্টা নষ্ট হয়েছিল। ১৯৬৮-তে ৮১৭ টি শ্রমবিরোধ দেখা দিয়েছিল, ২,৬৩,০০০ শ্রমিকের ভাগ্য জড়িয়ে পড়েছিল এবং নষ্ট হয়েছিল ৬০ লক্ষ শ্রমঘন্টা। ১৯৬৯-এ ৭১০টি শ্রমবিরোধ হয়েছিল, ৬,৪৫,০০০ শ্রমিক জড়িয়ে পড়েছিল তাতে এবং নষ্ট হয়েছিল ৮০ লক্ষ শ্রমঘন্টা। ৬৭ থেকে ৬৯ দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই রাজ্যের শ্রমচিত্রের গ্রাফটি কী দ্রুত নিচের দিকে নেমেছে তা এইসব হিসেব থেকেই বোঝা যাচ্ছে। ১৯৬৬-৬৭তে এ রাজ্যে পুঁজি বিনিযোগের পরিমান ছিল ২০৯ মিলিয়ন টাকা। ৬৮-৬৯এ তা নেমে এসে দাঁড়ালো ৯০ মিলিয়নে।

বামফ্রন্ট সরকার সতের বছর ক্ষমতায় কাটিয়ে দেবার পর এখন রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা করছেন বামফ্রন্ট নেতারা। রাজ্যের শিল্পায়নের জন্য এখন নতুন শিল্পনীতির কথা বলতে হচ্ছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের। রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের জন্য এখন বিদেশী এবং বহুজাতিক পুঁজিকে আহ্বান করে আনতে হচ্ছে। মার্ক্সবাদী মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক সংগঠন সি

আই টি ইউ-র নেতাদের অবধি বলতে হচ্ছে, রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থেই এখন অযথা জঙ্গী আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসতে হবে। প্রায় তিরিশ বছর আগে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে ভুলটি করেছিল, আজ সেই ভুলটি বুঝতে পারছেন বামফ্রন্ট নেতারা।

অবশ্য না বুঝে কোনও উপায় নেই। ৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সেই ভুল শিল্পনীতি এবং যুক্তফ্রন্ট নেতাদের দূরদর্শীতার অভাবের জন্য শিল্পক্ষেত্রে এত পিছিয়ে পড়তে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। ৬৭ সালে সেই জঙ্গী আন্দোলন পরবর্তী কালে উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং ক্রমশই এ রাজ্য সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন বিনিয়োগকারীরা। ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যাবে, ৬৭ সালের পর থেকে কী দ্রুত বিনিয়োগকারীরা চলে গেছেন অন্য রাজ্যে। অন্য রাজ্যে শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়েছে। এ রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণী সম্বন্ধে বিনিয়োগকারীদের সেই আস্থা আর ফিরিয়ে আনা যায়নি। এর বড়ো দায়ভাগ কিন্তু ৬৭-৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার অস্বীকার করতে পারে না। জঙ্গী এবং অনেক ক্ষেত্রেই অন্যায্য আন্দোলনে শ্রমিকদের ঠেলে দিয়ে তারা শ্রমিকদের সম্বন্ধে বিনিয়োগকারীদের আস্থাটাই নষ্ট করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কথায় কথায় চাকা বন্ধ করে দেওয়ায় মানসিকতাটাও জন্ম দিয়ে গিয়েছিল এই যুক্তফ্রন্ট সরকারই।

এই যখন অবস্থা, তখন প্রথম যুক্তফ্রন্টের শরিকি কোন্দলও তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ১৯৬৭-র মার্চ থেকে অক্টোবরের ভিতর এ রাজ্যে ১৪৭টি খুনের ঘটনা ঘটল। এইসব খুনের ঘটনার অধিকাংশই রাজনিতিক। শরিকি সংঘর্ষের ফলে খুন হয়েছিলেন এঁরা। যাঁরা খুন হয়েছিলেন তাঁদের ভিতর আবার আটজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাও ছিলেন। ব্যক্তিত্বহীন অজয় মুখার্জি অসহায়ের মত প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন এইসব ঘটনা। এমনকি, তিনি এ-ও দেখলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নির্দেশকে রীতিমত অমান্য করছেন উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য। ক্ষুব্ধ ব্যথিত অজয় মুখার্জি ঠিক করলেন তিনি পদত্যাগ করবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ২ অক্টোবর গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অনশনে বসলেন। ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় মার্ক্সবাদী মন্ত্রীরা যেমন অজয় মুখার্জি এবং অজয়বাবুর সহকর্মীদের সমালোচনা শুরু করেছিলেন, তেমনিই অজয়বাবুও এবার তলায় তলায় যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন কংগ্রেসের সঙ্গে। কংগ্রেসে তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধবকে অজয়বাবু বললেন, অতুল্য ঘোষকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস যদি আসে, তাহলে তিনিও কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গেই মন্ত্রিসভা করবেন। কিন্তু অতুল্য ঘোষকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস এলো না। ফলে অজয়বাবুর আচরণ মন্ত্রিসভার ভাঙন ডেকে আনা ছাড়া আর কোনও কাজে লাগলো না। গোটা রাজ্যের এই অরাজক অবস্থা কাজে লাগালো কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার। পশ্চিমবঙ্গে তদানীন্তন রাজ্যপাল ধর্মবীরকে কাজে লাগিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দিল তারা।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেওয়া এবং আবার দ্বিতীয় যুক্তফন্ট সরকার ক্ষমতায় আসা-মাঝখানের এই সময়টুকু নিয়ে আর আলোচনায় যাচ্ছি না। বরং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলটাও দ্রুত একটু চোখ বুলিয়ে নিই। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার বিদায় নেবার ৩৭১ দিন পরেই আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমল থেকেও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমল হয়েছিল আরও করুণ।

সবচেয়ে ভয়াবহ চেহারা নিয়েছিল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিটি। গোটা পশ্চিমবঙ্গকেই এক নৈরাজ্যবাদের দিকে ঠেলে নিয়ে এসেছিল সেই সময়ের রাজনীতি। এই সময়ই গোটা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়ল খুন-জখম এবং ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি।

১৯৬৯ সালের ১লা মে শহিদ মিনার ময়দানে জনসভার ভিতর দিয়ে জন্ম নিল সি পি আই (এম এল)। বাঙালি যুবকদের রোমান্টিক মানসিকতায় আর এক নতুন ঝড় এল। 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা' এবং 'চেয়ারম্যান মাও-এর নির্দেশিত পথে' বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক জোয়ার আসল বাঙালি যুবকদের ভিতর। এদের আদর্শ ছিল মহৎ, কিন্তু লক্ষ্য ঠিক ছিল না। যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন এঁদের, তাঁরা ভুল পথে চালিত করলেন এই যুবকদের। 'শ্রেণীশত্রু' আখ্যা দিয়ে সাধারণ স্কুল শিক্ষক, কনস্টেবল, সরকারি কর্মী এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের খুন করা শুরু হয়ে গেল। চোরাগোপ্তা খুনখারাপি লেগে গেল চারিদিকে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও চুপ করে বসে থাকলো না। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত নকশালপন্থীদের 'সি আই এ-এর এজেন্ট' আখ্যা দিলেন। প্রমোদবাবু এ-ও বললেন, 'পুলিশের গুলিতে কি নিরোধ লাগানো আছে, তাহলে নকশালরা মরছে না কেন?' অচিরেই দুই বিরোধী বামপন্থী শিবিরের লড়াইয়ে কলকাতার রাস্তা রণক্ষেত্রের রূপ নিল। দিন-দুপুরে লাশ পড়তে থাকল কলকাতার রাস্তায়। সন্ধ্যের পরই কলকাতার রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেতে শুরু করল। অন্যান্য প্রদেশ থেকে কলকাতায় লোক আসা কমে গেল। বিদেশি পর্যটকরাও এড়িয়ে যেতে শুরু করল কলকাতাকে। কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠল। এক পরিত্যক্ত নগরীর মতো মনে করতে লাগল সবাই কলকাতাকে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃখলা পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হয়েছিল, যা আর কখনই হয়নি।

শুধু যে নকশালপন্থীদের সঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির হানাহানি শুরু হল তা নয়। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টের ভিতর তার অন্য শরিকদের সম্বন্ধেও আক্রমণাত্মক মনোভাব নিল। শরিক দলের কর্মী-সমর্থকরাও আক্রান্ত হতে শুরু করল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী-সমর্থকদের কাছে। এক কথায়, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক সন্ত্রাস ছড়িয়ে অন্য শরিক দলগুলিকে নিজের তাঁবে আনার চেষ্টা শুরু করল। সি পি আই অভিযোগ করল, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিই খতমের রাজনীতি শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির দল বাংলা কংগ্রেস একটি অভিযোগ করে বলল, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মাত্র ছ মাসের ভিতর ৩৭৮টি খুন হয়েছে, শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই ৪০টি শরিকি সংঘর্ষ হয়েছে, ৩৬ জন শিক্ষককে ঘেরাও করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে, ২৯২ দাঙ্গাহাঙ্গামার ঘটনায় পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে থেকেছে। বলা দরকার, পুলিশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তখন জ্যোতি বসু।

কী রকম অরাজক অবস্থা চলছিল তখন তার দু-একটা উদাহরণ তুলে ধরি। ন্যাশনাল মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্টের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভরত কর্মীদের সঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং আর এস পির কর্মী সমর্থকদের সংঘর্ষ বেধেছিল। এই সংঘর্ষের ফলে হাসপাতাল চত্বরেই ব্যাপক বোমাবাজি চলেছিল। বাইশজন অসুস্থ রুগী হাসপাতালের ভিতরই রাজনৈতিক কর্মীদের ছোঁড়া বোমার ঘায়ে

আহত হয়েছিলেন। এই সময়ই জনতার সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত দুজন পুলিশ কর্মীর মৃতদেহ নিয়ে পুলিশের এক বিরাট বাহিনী বিক্ষোভ দেখাতে ঢুকে পরেছিল বিধানসভায়। বিধানসভা ভবনে ভাঙচুর চালিয়েছিল সেই উন্মত্ত পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বাহিনীর উগ্র রূপ দেখে বিধানসভার পিছনের দরজা দিয়ে সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা। একই রাতে কলকাতা শহরে পরপর সাতটি সিনেমা হলে বোমা মারা এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল। রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবে ভাঙচুর আগুন ধরিয়ে দেওয়া, ফরাসি কনসালের স্ত্রীর গাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে মারধর এসব ঘটনাও ঘটেছিল। এবং যত দিন যাচ্ছিল এসব হিংসাত্মক ঘটনা বাড়ছিলই, কমছিল না।

পশ্চিমবঙ্গের এই অরাজক-বিশৃঙ্খল অবস্থাকে তখন খুব ভালো করে ধরেছিলেন জিওফ্রে মুরহাউস। কলকাতার সেই সময়ের অরাজক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুরহাউস লিখেছিলেন, 'বঙ্গোপসাগর দিয়ে নৌকা চালিয়ে কলকাতা থেকে আন্দামানে গিয়েছিলেন ডিউক আর পিনাকী। তাঁরা যখন আন্দামান থেকে ফিরলেন, তখন দমদম বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানাতে বিশাল মানুষের ভীড় হল। দমদম বিমানবন্দর যাওয়ার পথে এক উৎসাহী কিশোর বাস থেকে পড়ে মারা গেল। বিমানবন্দরে টারমাকের ভিতর হাজার হাজার মানুষ ঢুকে পড়ল। তাদের কেউ কেউ বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিদেশি বিমানের গায়ে উঠে দাঁড়াল। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের তিনটি বিমানকে নিরাপত্তার খাতিরে হ্যাঙ্গারে ঢুকিয়ে দিতে হল। ডিউক-পিনাকীকে নিয়ে প্লেন দেরীতে এসে পৌঁছায়, প্লেনের চালককে লক্ষ্য করে জুতা ছোঁড়া হল। প্রায় তিনঘন্টা ধরে এই কাণ্ড চললো বিমানবন্দরের টারম্যাকে। আর এর পরেই বেশ কয়েকটি বিদেশি বিমানসংস্থা হুমকি দিয়েছিল কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর না করলে তারা এখানে আর বিমান নামাবেন না।' মুরহাউস বলছেন, এটি কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয়। কিন্তু এই একটি ঘটনার ভিতর দিয়ে বোঝা যায় কলকাতা সেদিন কতখানি বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল এবং কলকাতার ওপর কারোরই কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

আইন-শৃঙ্খলার এই পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার কোনও কঠোর পদক্ষেপই নিতে পারল না। বরং যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিকরাই পুলিশকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে বেড়াতে লাগল। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের উন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। বিনিয়োগকারী এবং পুঁজিপতিরা রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার এই চেহারা দেখে রাজ্য ছেড়ে পালাতে শুরু করলেন। নতুন বিনিয়োগকারী এবং পুঁজিপতিরাও আসতে আর ভরসা পেলেন না এখানে। এই সময় থেকেই শুরু হল পশ্চিমবঙ্গে শিল্পচিত্রের অধোগতি। এর ওপর তো ছিল ঘেরাও-এর হাঙ্গামা। ৬৭-৬৯-এ কী হয়েছিল শিল্পচিত্র সে তো আগেই বলেছি।

যুক্তফ্রন্টের অবস্থা আরও করুণ হয়ে দাঁড়ালো তার নেতা এবং মন্ত্রীদের আচরণে। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির সেই ব্যক্তিত্ব ছিল না যে, তিনি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। বা, তাঁর সরকারের পুলিশ মন্ত্রী জ্যোতি বসুকে আরও কঠোর হতে বলবেন সে মানসিক বলও অজয়বাবুর ছিল না। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বাগে আনতে না পেরে অজয়বাবু ৬৯ সালের ৮ অক্টোবর বাংলা কংগ্রেসের এক বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ করে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এসবের জন্য মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকেই দায়ী করলেন। এরপর দিল্লি গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনেও অজয়বাবু বললেন, পশ্চিমবঙ্গে জীবন এবং সম্পত্তির কোনও

নিরাপত্তা নেই। এরপর তিনি ১ ডিসেম্বর থেকে তিনদিনের অনশন সত্যাগ্রহে বসলেন। অজয় মুখার্জির এই সত্যাগ্রহ নিয়ে মার্ক্সবাদী মহল থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রব উঠল। সত্যাগ্রহের পর মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু জেলায় জেলায় ঘুরতে লাগলেন এবং সর্বত্রই বক্তৃতায় তাঁর অক্ষমতার কথা এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা তুলে ধরতে লাগলেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে আরও সংঘাত বাঁধতে শুরু করল অজয়বাবুর। যুক্তফ্রন্টকে অটুট রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অজয়বাবু নিজের সরকারকেই 'অসভ্য-বর্বরদের সরকার' হিসেবে অ্যাখ্যা দিলেন। বিধানসভার ভিতরই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিধায়করা তাঁকে অপমান করলেন। এবং সর্বশেষ পরিণতিতে ১৯৭০ সালের ৯ মার্চ অজয়বাবু এবং তাঁর বাংলা কংগ্রেসের সদস্যরা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পড়ে গেল।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এক অজানা অন্ধকার ভবিষতের ভিতর প্রবেশ করল। যে ব্যক্তিহত্যার রাজনীতির জন্ম দিয়ে গিয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার, সেই হত্যার রাজনীতি এরপরই ঘাঁটি গেড়ে বসল পশ্চিবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল সেই থেকেই। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে এক অবিশ্বাস জন্মে গেল সর্বত্র। সে অবিশ্বাস, সে অন্ধকার ৭২-৭৭ এর কংগ্রেস সরকার এবং তার পরে সতের বছরের বামফ্রন্ট শাসনও পুরোপুরি দূর করতে পারেনি। জনগণ অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছিল। জনগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাটুকু পদদলিত করেই বিদায় নিল যুক্তফ্রন্ট সরকার।

পাঁচ

এ রাজ্যের মার্ক্সবাদীদের নিয়ে কিছু আলোচনা করতে যাবার আগে এক ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে আলাদা করে একটু আলোচনা করে নিতেই হবে। তিনি হলেন জ্যোতি বসু। আজ সতের বছর ধরে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথাই আজ বামফ্রন্ট সরকারের শেষ কথা। তাঁর সিদ্ধান্তই আজ বামফ্রন্ট সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাঁর প্রভাবে আজ বামফ্রন্ট সরকার পুরোপুরি আছন্ন। বামফ্রন্ট সরকারের নৌকার হালটি তিনিই ধরে বসে আছেন। তিনি যেদিকে ঘোরাবেন বামফ্রন্ট সরকার সেদিকেই ঘুরবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গত পাঁচদশক ধরে জ্যোতি বসু এক উজ্জ্বল চরিত্র। পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ঘিরে এত আলোচনা এত সমালোচনার ঝড় বোধহয় কখনও ওঠেনি। আর সবকটি রাজনৈতিক চরিত্রের থেকেও ব্যতিক্রম জ্যোতি বসু। এখনও পর্যন্ত জ্যোতি বসুর উপমা জ্যোতি বসুই। অন্য আর কেউ নন। একাদিক্রমে সতের বছর মুখ্যমন্ত্রিত্বের আসনে থাকায় দীর্ঘকাল মুখ্যমন্ত্রী থাকার রেকর্ডটি জ্যোতি বসু স্পর্শ করেছেন। তেমনই পশ্চিমবঙ্গের মত একটি অবহেলিত রুগ্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও নিজ ব্যক্তিত্বে এবং রাজনৈতিক বুদ্ধিতে জাতীয় নেতার মর্যাদাটুকু আদায় করতে পেরেছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গেও জ্যোতি বসুর আগে পর্যন্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ই ছিলেন এরকম ব্যক্তিত্ববান আলোচিত চরিত্র। বিধানচন্দ্র রায়ের পরই পশ্চিমবঙ্গে আলোচিত চরিত্র হয়ে এসেছেন জ্যোতি বসু। মাঝে আর কাউকে

বাঙালি রাখার চেষ্টা করেনি। বাঙালি বিধানচন্দ্রের আমলের সঙ্গেই জ্যোতি বসুর আমলের তুলনা করতে পছন্দ করে তাই। মাঝে যে আরও কারো আমল ছিল, সেটাই বাঙালি ভুলে গেছে আজ।

বামপন্থী নেতা এবং বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কতখানি বামপন্থী? জিওফ্রে মুরহাউস তাঁর বইয়ে জ্যোতি বসুর চরিত্র চিত্রণটি করেছেন খুব সুন্দরভাবে। মুরহাউস লিখেছেন, জ্যোতি বসু এমন একজন মানুষ যাঁকে ঘিরে বাঙালি কল্পকথা তৈরি করেছে। সাধারণ বাঙালি তাঁকে তাঁদের আদর্শ মনে করেছে, যদিও সাধারণ বাঙালির সঙ্গে মিল তাঁর খুবই কম। জ্যোতি বসু একজন নিপাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ, পরনে সাদা ধপধপে ধুতি, মাথার চুল যত্ন করে তেল দেওয়া। আর সকলের থেকে তাঁকে আলাদা করা যায়। সাধারণ মানুষ তাঁকে আদর্শবাদী নেতা হিসেবেই জানেন। সাধারণ মানুষ জানেন তিনি এমন একজন আর্দশবাদী নেতা, যিনি জীবনে কখনও মদ্যপান করেননি। অথচ এর কোনটাই কিন্তু ঠিক নয়। আসলে তাঁকে দেখতে আর্দশবাদী নেতার মতই। তাঁর যেসব মুদ্রাদোষ আছে, সেগুলিও স্বাভাবিক না তৈরি করা সেটাও সহজে বোঝা যায় না। মুরহাউস লিখেছেন, জ্যোতি বসুর ভিতরে এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করে। জনগণের সামনে তাঁর সেই অস্থিরতা ধরা পড়ে না ঠিকই। কিন্তু বাড়িতে বা তাঁর সরকারি দপ্তরে যদি একান্তে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে, তিনি তাঁর পা দুটো সবসময়ই নাড়িয়ে যাচ্ছেন। বামপন্থীদের জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে, যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে, তখন মুরহাউস জ্যোতি বসুকে দেখেছিলেন এটা মনে রাখতে হবে। এ তো বিদেশীর চোখে জ্যোতি বসুকে দেখা। একজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী জ্যোতি বসুকে দেখার পর লিখেছিলেন-'জ্যোতি বসু পোশাকে আশাকে বাঙালি, স্বভাবে বৃটিশ এবং অন্তরে ফরাসি।' এই বাঙালি বুদ্ধিজীবীর নামটি সঙ্গত কারণেই করছি না। কেননা, ইনি দীর্ঘদিন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির যুব নেতা ছিলেন। খুব কাছ থেকেই দেখেছেন জ্যোতি বসুকে। বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠিত বাঙালি প্রতিষ্ঠানে ভালো পদে কর্মরত।

জ্যোতি বসুকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আরও একটি জিনিষ আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে। বাঙালি কাকে তাঁদের নেতা হিসেবে বেশি দেখতে চায়। কেন তাঁরা বিধানচন্দ্র এবং জ্যোতি বসুকেই পছন্দ করেছে বেশি। সাধারণ বাঙালির মানসিকতা খতিয়ে দেখলে এটা পরিষ্কার বোঝা যাবে, সাধারণ বাঙালি বরাবরই নেতা হিসেবে দেখতে চেয়েছে এমন ব্যক্তিত্ববান চরিত্রকে, যাঁর পিছনে থাকবে অভিজাত সমাজের একটি ছাপ। সেই কারণেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বা ব্যারিস্টার জ্যোতি বসুকে নেতা হিসেবে মানতে দেরী হয়নি বাঙালির। অথচ প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন বা অজয় মুখার্জিকে সে অর্থে কখনই নেতা বলে মানতে পারেনি আপামর বাঙালি। যদিও প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন বা অজয় মুখার্জির নিষ্ঠা বা সততা ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু বিধানচন্দ্র এবং জ্যোতি বসুর যে ব্যক্তিত্ব বা আভিজাত্য ছিল তা ছিল না প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জিদের।

জ্যোতি বসুর বেলায় আবার এর ওপর যোগ হয়েছিল তাঁর বামপন্থী ইমেজখানি। সাধারণ বাঙালি বরাবরই তাঁদের নেতাকে বিদ্রোহীর চরিত্রে কল্পনা করতেও চেয়েছে। যে কারণেই আজও গান্ধীর থেকে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বাঙালির ঘরে ঘরে বেশি।

ঠিক এই কারণেই ষাটের দশকে কংগ্রেস বিরোধীতায় নিজেদের বিদ্রোহী ইমেজ সম্বল করে বামপন্থীরা বাঙালির কাছে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন। এই বামপন্থীদের নেতা আবার ছিলেন জ্যোতি বসু। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য, বিপ্লবীয়ানা সব মিলিয়ে তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁয়েছিল।

জ্যোতি বসুর কাছে কিন্তু সাধারণ বাঙালি অনেক কিছু আশাও করেছিল। ৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, তখন সাধারণ বাঙালি জ্যোতি বসুকেই এ রাজ্যের অভিভাবক হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। সাধারণ বাঙালি ভেবেছিল, জ্যোতি বসুই হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি দলমতের ঊর্ধে উঠে দাঁড়িয়ে যিনি পশ্চিমবঙ্গকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন এবং একটি বিশেষ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গকে। ৮২ সাল পর্যন্ত জ্যোতি বসুর কাছে এই আশা বাঙালির ছিল। কিন্তু জ্যোতি বসুই বাঙালিকে সবথেকে বিমুখ করেছেন। যে বাঙালি জ্যোতি বসুকে এককথায় নেতা হিসেবে মানত, হতাশা আর ক্ষোভ থেকে সেই বাঙালিই কিন্তু এখন জ্যোতি বসুকে নিয়ে নিত্যনতুন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। জ্যোতি বসুর জীবনের ট্রাজেডি এটাই।

জ্যোতি বসু আজীবন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। জ্যোতি বসু একটি কমিউনিস্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী গত সতের বছর ধরে। অথচ খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, জ্যোতি বসু সে অর্থে কমিউনিস্ট হতে পারেননি কোনদিনই। জ্যোতি বসু কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একেবারে শেষ ধাপে, ১৯৪০ সালে। প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জি বা বিনয় চৌধুরিদের যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অতীত অভিজ্ঞতা আছে, স্বাধীনতা আন্দোলনে হাতেখড়ি করে তাঁরা যেমন এসেছেন কমিউনিস্ট পার্টিতে, জ্যোতি বসু তেমনভাবে আসেননি। স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও অভিজ্ঞতাও জ্যোতি বসুর নেই। জ্যোতি বসু ছিলেন স্বচ্ছল সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। এখানে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করে জ্যোতি বসু বিলেতে চলে যান ব্যারিস্টারি পড়তে। সেখানেই রজনী পামে দত্তের সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট হন জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসুর সমসাময়িক কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে জ্যোতি বসুর তুলনা করলে দেখা যাবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অন্যরা যখন কারাগারের অন্তরালে, কি আত্মগোপন করে দিন কাটাচ্ছেন, তখন জ্যোতি বসু বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ছেন। দেশের মাটি থেকে কমিউনিস্ট হওয়ার অনুপ্রেরণা নিচ্ছেন যখন অন্যেরা, তখন কমিউনিজমের হাতেখড়ি জ্যোতি বসুর হচ্ছে বিলেতের মাটিতে।

প্রথম থেকেই অন্যদের তুলনায় আলাদা জ্যোতি বসু। স্বাধীনতা সংগ্রাম করে, কারান্তরালে দিন কাটিয়ে, মাঠেঘাটে ঘুরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলে অন্যেরা যে জনপ্রিয়তা বা গ্লামার পাননি, বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরে এসে হঠাৎ করেই কমিউনিস্ট পার্টির মাথায় বসে পড়ে সে জনপ্রিয়তা কিন্তু অর্জন করতে পেরেছিলেন জ্যোতি বসুই। এখনও পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে যত নেতা এসেছেন, জনপ্রিয়তায় জ্যোতি বসুকে কেউ টেক্কা দিতে পারেননি। অথচ এত জনপ্রিয়তা যে নেতার, সেই জ্যোতি বসু কিন্তু কখনই জনগণের সঙ্গে মাখামাখি করেননি। জনগণ তো দূরের কথা, পার্টি কর্মীদের সঙ্গে এক দূরত্ব তিনি বজায় রেখে চলেছেন বরাবর। যে কারণেই প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জি বা বিনয় চৌধুরিরা যখন সবার কাছে প্রমোদদা,

সরোজদা বা বিনয়দা, তখন জ্যোতি বসু কিন্তু কারো দাদা হননি। উনি সবার কাছেই 'বাবু', জ্যোতিবাবু। আর এখন তো 'চিফ মিনিস্টার।' এই একটা ঘটনাই বুঝিয়ে দেয়, জনপ্রিয়তার নিরিখে জনপ্রিয়তম হলেও, আসলে জনতার সঙ্গে গা ঘষাঘষি করার ইচ্ছে তাঁর কোনদিনই ছিল না, আজও নেই।

তাঁর জীবনযাপনেও জ্যোতি বসু আর পাঁচজন কমিউনিস্ট নেতার থেকে ভিন্ন। কমিউনিস্ট ছাপ তাঁর চালচলনে কোনোদিনই পড়েনি। তাঁর সমসাময়িক কমিউনিস্ট নেতারা যখন নিতান্ত কষ্টে সহজ-সরল অনাড়ম্বড় জীবনযাপন করছেন, তখন জ্যোতি বসুর জীবন কাটছে কিন্তু যথেষ্ট আয়েসেই। তাঁর সমসাময়িক কমিউনিস্ট নেতারা যখন মাঠেঘাটে ঘুরে শ্রমিক-কৃষক সংগঠন করে বেড়াচ্ছেন, তখন কিন্তু জ্যোতি বসু টেনিস খেলার অভ্যাসটি বজায় রেখে চলেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির অতি দুর্দিনেও জ্যোতি বসুর জন্য ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর টিকিটই বরাদ্দ হয়েছে। জ্যোতি বসু একমাত্র কমিউনিস্ট নেতা, যাঁকে পুঁজিপতি শিল্পপতিরাও বিশ্বাস করেছেন। জ্যোতি বসু বিরোধী দলে থাকার সময়ও পুঁজিপতি, শিল্পপতিদের সাহায্য-সমর্থন পেয়েছেন। বিরোধী নেতা থাকার সময় পোদ্দারদের গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর টাটা-আম্বানি-গোয়েঙ্কা-ওবেরয়রা তাঁর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিড়লাদের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব অনেকদিনের। এইসব শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের জ্যোতি বসু কোনোদিনই শ্রেণীশত্রু মনে করেননি। বরং কমিউনিস্ট পার্টির একজন সাধারণ সভ্যসমর্থকের সঙ্গ থেকে এঁদের সঙ্গে জ্যোতি বসুকে অনেক সপ্রতিভ, উজ্জ্বল মনে হয়েছে বরাবর। বেসরকারিকরণকে স্বাগত জানিয়ে যে শিল্পনীতি নিয়ে এখন হৈ-চৈ শুরু হয়েছে-এ শিল্পনীতি জ্যোতি বসুর কাছে নতুন কিছু নয়। জ্যোতি বসুর চিন্তাধারায় বরাবরই এ শিল্পনীতি ছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ও জ্যোতি বসু গিয়েছিলেন বিড়লাদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করতে। জ্যোতি বসু এমন একজন কমিউনিস্ট নেতা, যিনি প্রতিবছরই বিদেশে বেড়াতে যান, এবং কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশে নয়, পাশ্চাত্য ধনবাদী দেশেই বেড়াতে যেতে তিনি পছন্দ করেন। তাঁর পার্টির অন্য নেতারা যখন ব্যস্ত থাকেন সংগঠনের কাজ নিয়ে, জ্যোতি বসু তখন তাঁর জন্মদিন পালন করেন পাঁচতারা হোটেলে।

তাঁর সমসাময়িক কমিউনিস্ট নেতারা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে আলাদা করতে পারেননি। তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত জীবন গ্রাস করে নিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। জ্যোতি বসু কিন্তু তা পেরেছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রবেশ করতে দেননি। অন্য কমিউনিস্ট নেতাদের বাড়িতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সমর্থকরা ভীড় করার সুযোগ পেলেও, জ্যোতি বসুর বাড়িতে পারেনি। অন্য কমিউনিস্ট নেতাদের সহধর্মিনীরা তাঁদের স্বামীদের পাশাপাশি পার্টির কাজে নামলেও, জ্যোতি বসুর সহধর্মিণী তা নামেননি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জ্যোতি বসুর পুত্র কোটিপতি ব্যবসায়ী শিল্পপতিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

কাঠিন্যর আবরণে নিজেকে ঘিরে নিজের একটা অদ্ভুত ইমেজও তৈরি করেছেন জ্যোতি বসু। অসমাপ্ত বাক্যে কথা বলা, দ্রুতগতিতে হাঁটাচলা, জনসমক্ষে একটি গাম্ভীর্য বজায় রাখা, একটি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখানো—এগুলি জ্যোতি বসুর নিজেরই গড়ে তোলা। তাঁর এই স্বভাবগুলিই আজ তাঁর নামের সঙ্গে সমার্থক হয়ে গিয়েছে।

আর এখন এমন অবস্থা যে, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অনেক উঠতি নেতাও তাঁকে নকল করে অসমাপ্ত বাক্যে কথা বলতে শুরু করেছেন। তবে জ্যোতি বসুর যা আছে তা অন্য কমিউনিস্ট নেতাদের নেই। তা হল তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। আর এখানেই তিনি ছাপিয়ে গেছেন সবাইকে।

তবে, সে অর্থে জ্যোতি বসু কোনওদিন কমিউনিস্ট হতে পারেননি বলেই, অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের থেকে অনেকখানি সঙ্কীর্ণতা মুক্ত তিনি। তাঁর কোনও অহেতুক ছুঁৎমার্গ নেই। ছুঁৎমার্গ নেই বলেই, তিনি প্রয়োজনে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন, বন্ধুত্ব করতে পারেন শিল্পপতিদের সঙ্গেও। এবং এ নিয়ে অন্য কমিউনিস্টরা কে কী মনে করলেন, তা নিয়ে আদৌ জ্যোতি বসু মাথা ঘামান না। তিনি তাঁর মতো একটি স্বতন্ত্র পথে চলাফেরা করতে ভালোবাসেন।

কমিউনিস্ট না হয়েও বামফ্রন্ট সরকারে এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনিই এখন শেষ কথা। সরকারে অবশ্য জ্যোতি বসু প্রথম থেকেই এক এবং অদ্বিতীয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত যতদিন বেঁচে ছিলেন, সংগঠন জ্যোতি বসুর অতটা করায়ত্ত ততদিন ছিল না। নিজেদের ভিতর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দরুণ একটা বোঝাপড়ায় জ্যোতি বসু এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত এসেছিলেন যে, সাংগঠনিক কাজে যেমন জ্যোতি বসু মাথা গলাবেন না, তেমনি প্রশাসনের কাজেও কখনও মাথা গলাবেন না প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রমোদবাবু মারা যাওয়া পর্যন্ত দুজনের এই অলিখিত চুক্তি বজায়ই ছিল। প্রমোদবাবু মারা যাবার পর জ্যোতি বসুকে ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত পার্টিতে আর কেউ রইলেন না। পার্টির একাংশ চেয়েছিলেন সমর মুখার্জিকে প্রমোদবাবুর পর রাজ্য সম্পাদক করতে। জ্যোতি বসুর হস্তক্ষেপে তা হল না। রাজ্য সম্পাদক হলেন সরোজ মুখার্জি। সরোজবাবুর সততা সন্দেহাতীত হলেও, জ্যোতি বসুকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল না। সরোজবাবুর পর রাজ্য সম্পাদক হলেন শৈলেন দাশগুপ্ত। শৈলেন দাশগুপ্ত পার্টিতে জ্যোতি বসুরই খোদ লোক। প্রশাসন তো প্রথম থেকে কব্জাতেই ছিল, প্রমোদবাবুর মৃত্যুর পর এভাবে রাজ্য পার্টিকেও করায়ত্ত করেছেন জ্যোতি বসু। আর আজ, প্রশাসন তো বটেই, পাটিতেও জ্যোতি বসুর ঠিক করে দেওয়া সিদ্ধান্তই পার্টির সিদ্ধান্ত। তার সব থেকে বড় উদাহরণ শিল্পনীতি। বিদেশি এবং বেসরকারি পুঁজিকে স্বাগত জানিয়ে আনার শিল্পনীতি নিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে দ্বিমত রয়েছে, রয়েছে বিস্তর বিতর্ক। তবু এই শিল্পনীতিকেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মেনে নিতে হচ্ছে। মেনে নিতে হচ্ছে এই কারণেই যে, এই শিল্পনীতি জ্যোতি বসু নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর জ্যোতি বসুর মুখের ওপর প্রশ্ন করার ক্ষমতা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কোনও নেতারই এখন নেই।

প্রসঙ্গত, আরও একটা বিষয় উল্লেখ করি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুই একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী, যাঁকে এবং যাঁর পরিবারবর্গকে ঘিরে ব্যক্তিগত কারণে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পুত্রের রাতারাতি কোটিপতি হওয়া, তাঁর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের নানারকম বেআইনি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা—এইসব অভিযোগ গত সতের বছরে উঠেছে। এঁদের কেন্দ্র করে অভিযোগের আঙুল উঠেছে মুখ্যমন্ত্রীর দিকেও। কিন্তু জ্যোতি বসুর আগে যাঁরা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়,

প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জি এমনকি ৭২-৭৭ জমানায় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়—কারোর বা এঁদের কারোর পরিবারের বিরুদ্ধেই কিন্তু কখনও এই ধরনের অভিযোগ ওঠেনি। এঁদের রাজনীতি, সরকার পরিচালনায় এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী—এসব নিয়ে হাজার সমালোচনা উঠলেও, এঁদের ব্যক্তিগত সততা প্রশ্নের ঊর্দ্ধেই থেকে গেছে। জ্যোতি বসু এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের বিরুদ্ধে গত সতের বছরে যে অভিযোগ উঠেছে, তা প্রমাণ সাপেক্ষ হলেও একথা তো স্বীকার করতেই হবে এ ধরনের অভিযোগ ওঠার মত পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে। নয়তো এ ধরনের অভিযোগ উঠবে কেন?

সতের বছর ধরে এই জ্যোতি বসু নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, ৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল তখন এই জ্যোতি বসুর ওপর অগাধ আস্থা রেখেছিল পশ্চিমবঙ্গবাসী। পশ্চিমবঙ্গবাসীর ধারণা ছিল, জ্যোতি বসু অন্তত তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবেন। জ্যোতি বসুকে দ্বিতীয় বিধানচন্দ্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গবাসী। দুঃখের বিষয়, জ্যোতি বসু কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর এই বিশ্বাস, এই আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা দিতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গকে নেতৃত্ব দেওয়ার মত ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসুর ছিল। কিন্তু নেতৃত্ব দেওয়ার আগ্রহই জ্যোতি বসু প্রকাশ করলেন না। তাঁর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই পশ্চিমবঙ্গ সবথেকে বেশি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। যে জ্যোতি বসু ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের চোখে হিরো, প্রায় রূপকথার রাজপুত্রের মতই, সতের বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর সেই জ্যোতি বসুই আজ জনগণের কাছে বিশ্বাসভঙ্গকারী এক ভিলেন। নিন্দা, ঠাট্টা এবং বিদ্রূপের পাত্র। জ্যোতি বসুর কাছে এটাই কি যথেষ্ট বেদনাবহ নয়?

ছয়

সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলন ছিল এক আদর্শবাদী দিক্‌ভ্রান্ত আন্দোলন। নিছক ব্যক্তিহত্যা করে বা চোরাগোপ্তা দু-একটা আক্রমণ হেনে যে রাষ্ট্রকাঠামোর সামগ্রিক পরিবর্তন আনা যাবে না এই সারসত্যটা নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতারা প্রথমে অনুধাবনই করেননি। তাঁরা এক রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারের পথই নিতে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝেছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে পাগলা ঘোড়ার রাশ তাঁদের হাতের বাইরে চলে গেছে। তবু, বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাসে নকশালবাড়ি আন্দোলনের একটি গুরুত্ব ছিল এবং তা বরাবরই থেকে যাবে।

ব্যক্তিহত্যা এবং চোরাগোপ্তা আক্রমণের পথে গিয়ে নকশালপন্থীরা তাদের নিজেদের পতনের পথ নিজেরাই ডেকে আনল। তাদের ব্যক্তিহত্যা এবং চোরাগোপ্তা আক্রমণের রাজনীতি কার্যত নৈরাজ্যবাদ ছাড়া আর কোনও কিছুরই জন্ম দিল না। ফলে, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মনে নকশালপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে একরকম ভীতি ছাড়া আর কোনও বিশ্বাস গড়ে উঠল না। নকশালপন্থীদের এইভাবে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটাকেই প্রবলভাবে কাজে লাগিয়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্র। নকশালপন্থীদের ভিতরে খুব সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল একদল সমাজবিরোধীকে। নকশালপন্থার নাম নিয়ে তারা সমাজবিরোধী কার্যকলাপই শুরু করল। পুরো রাজ্য জুড়ে খুনখারাপি-লুটতরাজের অবাধ রাজত্ব চলল,

সে তো আগেই বলেছি। এরই ভিতর ব্যক্তিগত এবং মতাদর্শগত সংঘাতে নকশালপন্থীরাও ভাগ হয়ে গেল নানা গোষ্ঠীতে। ফলে, নকশালপন্থী আন্দোলন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু এই যে খুনজখমের রাজনীতি শুরু হয়েছিল ৬৯-এ, তা পাড়ায় পাড়ায় জন্ম দিয়ে গেল মস্তানরাজ। ৭২-এর নির্বাচনে ব্যাপকভাবে মস্তানরা রাজনৈতিক দলগুলির হয়ে নির্বাচনে নেমে পড়ল। বুথদখল, বোমাবাজি, ভোটারদের ভয় দেখিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া, রিগিং-সবই হল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন ঘটনার সূত্রপাত হল সেই থেকে। তার আগে, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত নির্বাচনগুলি বুথদখল আর রিগিং-এর ফলে প্রহসনে পরিণত হয়নি। ৭২-এর নির্বাচনে কংগ্রেস ফের ফিরে এল ক্ষমতায়। কিন্তু ক্ষমতায় ফিরে এসেই কংগ্রেস ৬৭-৬৯-এ মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সন্ত্রাসের বদলা নিতে শুরু করল। পাড়ায় পাড়ায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের ঘরছাড়া করা হল। খুনখারাপি, মারদাঙ্গা বাদ গেল না। ৭২-৭৭ এ কংগ্রেসের এই জমানাও পশ্চিমবঙ্গের একটি দুঃসময়। কংগ্রেসী নেতাদের চূড়ান্ত গোষ্ঠীবাজি, কংগ্রেসের গোষ্ঠীসংঘর্ষ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, সর্বোপরি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, মস্তান রাজ এবং দুর্নীতি এসবই জনগণকে কংগ্রেস সম্পর্কে হতাশ এবং ক্রুদ্ধ করে তুলল।

জরুরি অবস্থার অবসানে ৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট ফিরে এল ক্ষমতায়। ৭৭ সালের সেই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। ৭২-৭৭ এ কংগ্রেসি নেতাদের অপদার্থতা প্রত্যক্ষ করেই পশ্চিমবঙ্গবাসী ক্ষমতায় এনেছিল মার্ক্সবাদীদের। এবং এবার মার্ক্সবাদীদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার পিছনে অনেক বেশি আশা-আকাঙ্খা কাজ করেছিল। ৬৭ থেকে যে হানাহানি, মারামারির রাজনীতি শুরু হয়েছিল, ৭২-৭৭-এর কংগ্রেস আমলে গিয়ে যা রূপ পেয়েছিল মস্তান রাজের, তা যাতে বন্ধ হয়, ৬৭ থেকে যে আধাগতি শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের, তা যাতে বন্ধ হয়, সেই আশা-আকাঙ্খা নিয়েই ৭৭ সালে মার্ক্সবাদীদের ক্ষমতায় এনেছিল পশ্চিমবঙ্গের জনগণ। মার্ক্সবাদী নেতাদের ইমেজে তখনও পর্যন্ত কালি লাগেনি। তখনও পর্যন্ত তাঁরা জনতার পাশেই ছিলেন। তাই মার্ক্সবাদীদের অবিশ্বাসও করতে পারেননি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। পাশাপাশি, কংগ্রেসের নেতারা তাঁদের কদর্য চেহারাটি আগেই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন।

৭৭ সালে তো ক্ষমতায় এলেন মার্ক্সবাদীরা। কিন্তু তারপর তাঁরা কী করলেন? তাঁরা কী এই আশা-আকাঙ্খা অটুট রাখতে পারলেন? তাঁরা কিন্তু তা পারলেন না। বরং ক্ষমতায় এসে মার্ক্সবাদীদের চরিত্রেও দ্রুত বদল ঘটতে শুরু করল। আর মার্ক্সবাদীদের এই চারিত্রিক বদল দেখে তাঁদের সম্বন্ধেও জনগণের আশাভঙ্গের কারণ ঘটল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখলো যা বলেছিলেন মার্ক্সবাদীরা, ক্ষমতায় এসে ঠিক তার উল্টো কাজটাই তাঁরা করলেন। মার্ক্সবাদীদের এই বদলের ঘটনাটি সব থেকে ভালো ধরা পড়বে তাঁদের আমলে গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার রক্ষার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেই। গত সতের বছরে মার্ক্সবাদীদের এটাই দুর্বলতম জায়গা।

৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা এটা বুঝেছিলেন, পাল্টা আঘাত হানার রাজনীতি শুরু করলে এই সরকারের ভাগ্যও ৬৭-৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট সরকারের মতোই হবে। বরং, দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকার জন্য মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে প্রথমেই শক্ত হাতে রাশ ধরেছিলেন

পার্টি কর্মীদের। পার্টির তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টি কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোনরকম পাল্টা আঘাত করা চলবে না।

৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার আগে এবং ক্ষমতায় আসার পরে এখনও পর্যন্ত মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি একটি ইস্যুকে বারবার প্রধান ইস্যু করে তুলেছে। তা হল, ৭২-৭৭-এর কংগ্রেসি জমানায় এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার সমূহ কিভাবে পদদলিত হয়েছে। কতখানি দমন পীড়ন চলেছে রাজনৈতিক কর্মী এবং সাধারণ মানুষের ওপর। ৭২-৭৭ এই সময়ে তাদের বারোশো কর্মীর খুন হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলতে আজও ভোলে না মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। এই মার্ক্সবাদী সরকারের আমলে সেই গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার সমূহ কতখানি সুরক্ষিত হয়েছে?

কতখানি সুরক্ষিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে দুটি কথা বলে নিই। জরুরি অবস্থা চলাকালীন বা কংগ্রেসি জমানায় পার্টি কর্মীদের ওপর পুলিশ এবং কংগ্রেস কর্মীদের নিপীড়নের অসংখ্য অভিযোগ মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তুলেছেন। কিন্তু নেতারা কিন্তু কোনরকম সংঘাতেই যেতে চাননি। বরং, জরুরি অবস্থা চলার সময়ই জ্যোতি বসুর মতো নেতা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পাশে বসে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টেনিস খেলা দেখে সময় কাটিয়েছিলেন। কংগ্রেস আমলে বারোশো পার্টি কর্মী খুন এবং পুলিশি হেপাজতে অসংখ্য পার্টি কর্মীর নির্যাতনের কথা এখনও বলে থাকেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। কিন্তু, গত সতের বছর টানা ক্ষমতায় থাকার পরও আজ অবধি ওই সময় রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর নির্যাতনকারী দোষী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই মার্ক্সবাদী সরকার নিতে পারেনি। উল্টে, রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর অত্যাচার করে কুখ্যাত হওয়া কয়েকজন পুলিশ অফিসারের এই মার্ক্সবাদীদের আমলেই পদোন্নতি ঘটেছে। কংগ্রেসি নেতাদের বদলে, জমানা পাল্টে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই পুলিশ অফিসাররাই মাকর্সবাদী নেতা-মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ অনুচর হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা উল্লেখ করাও ভালো যে, ৭২ সালে কংগ্রেসি জমানার সময়ে ৭২-৭৩-এ এই রাজ্যে পুলিশ বাজেট ছিল ৩০.৮৪ কোটি টাকা। আর ৭৭-এ মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর ৮৫-৮৬-তে মার্ক্সবাদী সরকারের পুলিশ বাজেট হল ১৩৬.৩৭ কোটি টাকা। ৮৮-৮৯-তে হল ২১৭.১৩ কোটি টাকা। ৮৯-৯০-তে হল ২৪০.২৪ কোটি টাকা। মার্ক্সবাদী সরকারের আমলে পুলিশ বাজেট এভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লই। কমল না।

কিন্তু, যে মার্ক্সবাদীদের আমলে পুলিশের পিছনে খরচা এভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল, সেই মার্ক্সবাদী সরকারের পুলিশের হাতে কতোখানি সুরক্ষিত হল মানবিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ। পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনাগুলির দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত চালানো একটি সমীক্ষায় দেখেছে, এই সময়ের ভিতর পুলিশ লক আপে ৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৮৫-৯১ এই সময়ের ভিতর পুলিশি লক আপে মারা গেছেন ৪৩ জন। অথচ ৮৭ সালেই ট্যাংরা থানা উদ্বোধনের সময় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'কোনও সভ্য দেশে পুলিশ

লক আপে খুন হয় না।' অবাক কাণ্ড, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর শাসনকালেই তা কিন্তু একের পর এক ঘটেছে।

বামফ্রন্ট আমলে পুলিশি লক আপে এই মৃত্যুর ঘটনাগুলি কী রকম? কয়েকটি ঘটনা তুলে দিই। কমল ঠাকুরের ঘটনাটাই তুলে ধরা যাক প্রথমে। ১৯৮০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার গোলমোহর এলাকার একটি দোকানের ওপর হামলা করার অপরাধে ওই মাসেরই ২৬ তারিখ কমল ঠাকুর নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গোলাবাড়ি থানায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন গুরুতর আহত অবস্থায় পুলিশ কমল ঠাকুরকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে কমল ঠাকুরকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। কমল ঠাকুরের পিতা শৈলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিযোগ করেছিলেন যে, পুলিশ পিটিয়ে তাঁর ছেলেকে মেরে ফেলেছে। হাসপাতালে কমল ঠাকুরের মৃতদেহে সাংবাদিকরা সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ, গলায়, মাথায়, পিঠে, বুকে, হাঁটুতে ক্ষত চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। ময়না তদন্তের রিপোর্টেও বলা হয় যে, কমল ঠাকুরকে মারা হয়েছে। বিধানসভাতে কমল ঠাকুর প্রসঙ্গটি ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেসব পুলিশ কর্মী ওই সময় ডিউটিতে ছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তের সুবিধার জন্য তাদের বদলি করা হয়েছে। তবে সাসপেনশন করা হয়নি। এরপর আটবছর কেটে গেছে। ৮৮ সালে কমল ঠাকুরের পিতা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতিকে জানান, দোষীদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার তখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাই তিনি বাধ্য হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। এর কয়েক বছর পরই হাওড়ার রাস্তাতেই একটি লরি এসে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেল কমল ঠাকুরের বাবাকে। এই 'অস্বাভাবিক' পথ দুর্ঘটনায় কমল ঠাকুরের বাবা মারা যান।

৮২ সালের একটা ঘটনার কথা বলি। ওই বছরই মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতে বৈদ্যনাথ ঘোষ নামে একজনকে নকশালপন্থী সন্দেহে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশি হেপাজতেই কান্দি থানার পুলিশ লক আপে ওই বন্দির মৃত্যু হয়। ঘটনাটি এরকম। ১৯৮২-র ১৭ এপ্রিল কান্দি থানার পুলিশ বৈদ্যনাথ ঘোষের বাবা-মাকে থানায় ডেকে নিয়ে আসে। পুলিশ বৈদ্যনাথের বাবা-মাকে বলে, একটা সাদা কাগজে সই করে দিলেই বৈদ্যনাথকে পুলিশ ছেড়ে দেবে। সেদিনই আবার জেলার পুলিশ সুপারের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে বিরাট ভোজের আয়োজন ছিল। বৈদ্যনাথের বাবা-মাকে সেই ভোজের খাবারও খাওয়ায় পুলিশ। খাওয়া-দাওয়ার পরে পুলিশ বৈদ্যনাথের বাবা-মাকে নিয়ে যায় হাজতের বাথরুমে। বৈদ্যনাথের বাবা মা দেখেন, বাথরুমে লোহার পাইপে তাঁদের ছেলের দেহ গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে। পুলিশ বৈদ্যনাথের বাবা-মাকে বলে, 'দ্যাখ, তোদের ছেলে কিভাবে মরেছে।' পুলিশ বৈদ্যনাথের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কান্দি শহরের মানুষ পুলিশের বক্তব্য মেনে নিতে পারেনি। কান্দি শহরের মানুষের বক্তব্য ছিল, পুলিশই বৈদ্যনাথকে খুন করে ওভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছে। সি পি আই এবং আর এস পি থানায় বিক্ষোভ দেখায়। আর এস পির মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এ ঘটনায়।

খোদ লালবাজারের পুলিশি লক আপে ইদ্রিসের মৃত্যু প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ইদ্রিসের মৃত্যুর পিছনে আবার একটি ব্যাক গ্রাউন্ড আছে। গার্ডেনরিচ এলাকার দুষ্কৃতী এবং সমাজবিরোধীদের দমন করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন তৎকালীন ডি সি (পোর্ট)

বিনোদ মেহতা এবং তাঁর দেহরক্ষী। বিনোদ মেহতা এবং তাঁর দেহরক্ষীকে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধেই ইদ্রিসকে পুলিশ ধরে। কিন্তু ওই অঞ্চলে সমাজবিরোধীদের চাঁই বামফ্রন্টেরই এক প্রথম সারির নেতা ও মন্ত্রী এবং তাঁর মদতেই ওই এলাকায় যাবতীয় সমাজবিরোধী কাজকর্ম চলে—এরকম গুঞ্জনও শোনা যেতে থাকে। এইরকমই পরিস্থিতিতে ১৯৮৪ সালের ২৮ মার্চ লালবাজারের লক আপে ইদ্রিসকে পিটিয়ে মেরে ফেলে পুলিশ। ইদ্রিসকে এভাবে মারার পর বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ওঠে, অনেক বড় চাঁইকে বাঁচানর জন্যই ইদ্রিসকে পুলিশের লক আপে মেরে ফেলা হল। জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত সরকার সমরেন্দ্র নাথ দেব কমিশন বসান। কিন্তু সেই কমিশনের রিপোর্ট এখনও বিশ বাঁও জলের নিচে।

একটা হিসাবে দেখা গেছে, ৮১ সালে পুলিশি লক আপে মারা গেছেন ২ জন, ৮২-তে পুলিশি হেপাজতে মারা গেছেন ৭ জন। ৮৩-তে লক আপে মারা গেছেন ৮ জন, ৮৪-তে পুলিশি হেপাজতে ১১ জন, ৮৫-তে ৭ জন, ৮৬-তে ৯ জন, ৮৭-তে ৮ জন, ৮৮-তে ১৯ জন এবং ৮৯ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ৪ জন। অবশ্য এর পরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। এর বাইরেও অনেক ঘটনা রয়েছে বলেও দাবি করেন অনেকে।

এইসব ঘটনাগুলি প্রত্যেকটাই কিন্তু মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। একটা কথা মনে রাখতে হবে, গ্রেপ্তার করা মানেই পিটিয়ে মেরে ফেলার দায়িত্ব কিন্তু পুলিশের ওপর বর্তায় না। যাকে গ্রেপ্তার করা হল, আত্মপক্ষ সমর্থনে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার তার আছে। এবং বিচার ও শাস্তিবিধানের ভারটা পুরোপুরিই আদালতের ওপরই বর্তায়। সেক্ষেত্রে পুলিশ নিজেই যদি বিচারাধীন বন্দিদের লক আপে পিটিয়ে মেরে ফেলতে থাকে, তাহলে তা মানবিক অধিকারসমূহকেই পদদলিত করা হয়। এই যে লক আপে মৃত্যুর ঘটনাগুলি দিলাম, তা বিচার করলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, পুলিশের আচরণ যথেষ্টই সন্দেহজনক। এবং পুলিশের লক আপে যে নির্যাতনের ঘটনাগুলি ঘটেছে, সেরকম নির্যাতন সত্যিই সভ্য দেশে হয় না।

৮১ থেকে ৮৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসেবটিতে দেখা গেছে ৮১ জন বন্দির মৃত্যু ঘটেছে লক আপে। দেখা যাচ্ছে, এই ৮১ জনের ভিতর আবার ১৭ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী। এই সতের জনের ভিতর সি পি আই-র ২ জন, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ২ জন, এস এফ আই-র ১ জন, ডি ওয়াই এফ-এর ১ জন, সি আই টি ইউ-র ১ জন, নকশালপন্থী ৫ জন, আর এস পি ১ জন, এস ইউ সি ১জন এবং কংগ্রেসের ৩ জন। এই ১৭ জন রাজনৈতিক কর্মীরই রহস্যজনকভাবে পুলিশ লক আপের ভিতর মৃত্যু হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুলিশ লক আপে ভয়াবহ চেহারার আরও দু-একটি ছবি তুলে দিই। ১৯৮৯ সালের ২ মে হাসনাবাদ থানার তৎকালীন ও. সি. স্বপন দাস জনা দশেক সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে কাঠুরিয়া পাড়ায় হানা দেন এবং পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেন। ওই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে ম্যাটাডোর গাড়িতে তোলা হয়। গাড়িতে তোলার সময় ওদের অশ্রাব্য গালিগালাজ করা হয়। মতিয়ার, রফিউল এবং মজনু নামে তিনজনকে লাঠি দিয়ে হাত ও পায়ের সংযোগস্থলগুলিতে মারা হয়। ওদের মারতে মারতেই ও. সি. বলেন, 'থানায় নিয়ে গিয়ে ডাকাতির সাধ মিটিয়ে দেব।'

থানায় নিয়ে এসে রফিউলকে প্রচণ্ড মারা হয়। রফিউলের পর বেধড়ক পেটানো হয় মজনুকে। সবশেষে আসে ৫৫ বছর বয়স্ক মতিয়ারের পালা। মতিয়ার বেধড়ক মারের চোটে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। তারই ভিতর ও. সি. মতিয়ারের তলপেটে প্রচণ্ড জোরে লাঠির আঘাত করেন। মতিয়ার মাটিতে পড়ে যায় এবং তার মুখ দিয়ে গাঁজা বেরতে থাকে। ও. সি. দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে মতিয়ারের মলদ্বারে এবং নাকে গুঁজে দেন। এই অত্যাচারেই মতিয়ার মারা যায়। এরপরে পুলিশ গল্প সাজায় থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে মতিয়ার পুলিশ ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। তাতেই সে মারা যায়। মতিয়ারের গ্রামের মানুষ পুলিশের এ কথা একেবারেই মেনে নেননি। পুলিশের এই অত্যাচারের প্রতিবাদে দুদিন তাঁরা মতিয়ারের দেহ কবর দেননি।

মতিয়ার এলাকায় সি পি আই কর্মী ছিল। হলুদ আর আদা বেচত সে হাটে। ডাকাতির মিথ্যা মামলায় জড়িয়েই পুলিশ তাকে তুলে আনে। মতিয়ারের মৃত্যুর বিষয়টি বামফ্রন্ট কমিটিতে তুলেছিল সি পি আই।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। ১৯৮৭ সালের ২২ অক্টোবর রাতে কলকাতার তারক প্রামাণিক রোডের বাসিন্দা মনোহর জয়সওয়াল এবং তার ভাই প্রতাপ জয়সওয়ালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জোড়াসাঁকো থানায় নিয়ে যায়। পুলিশি লক আপে প্রতাপের সামনেই মনোহরের ওপর শুরু হয় অমানুষিক নির্যাতন। মনোহরকে দড়ি দিয়ে ওপর থেকে ঝুলিয়ে ডাণ্ডা দিয়ে মারা হয়। তার পরদিন রাতেও লক আপে ফের মনোহরের ওপর চলে ওইরকম অমানুষিক প্রহার, প্রচণ্ড প্রহারের ফলে মনোহর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। এরপর থানার পুলিশরা মনোহরের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে চিৎপুর রোড এবং মুনশি সফরুদ্দিন লেনের সংযোগস্থলে রেখে আসে। পুলিশ গল্প ফেঁদে বলে যে, তারা গুরুতর আহত অবস্থায় মনোহরকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছিল। তারাই মনোহরকে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং হাসপাতাল মনোহরকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এর ঠিক পরেই ২৮ অক্টোবর শিবকুমার পাণ্ডে নামে এক ব্যক্তি লিখিত বিবৃতিতে অভিযোগ করেছিলেন যে, মৃত মনোহর জয়সওয়ালের সঙ্গে পুলিশ ওই রাতে তাঁকেও নির্মমভাবে প্রহার করেছিল।

খোদ বামফ্রন্টের জমানাতেই এই হচ্ছে পুলিশ লক আপের চেহারা।

সতের বছরের বামফ্রন্ট জমানাতে পুলিশের লক আপে এভাবে যখন মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে, তখন অতীতে এ বিষয়ে বামপন্থী নেতাদের কী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, একবার চট করে দেখে নেওয়া যাক। ১৯৬৬ সালে এ রাজ্যে ক্ষমতায় কংগ্রেস সরকার। বামপন্থীরা তখন বিরোধী। কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে তখন পশ্চিমবাংলা উত্তাল। ওই বছরই ১৮ মার্চ বেলেঘাটা থানার পুলিশ নিমাই সরকার নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। ২৪ মার্চ নিমাই সরকার বেলেঘাটা থানার লক আপে মারা যান। পুলিশি লক আপে এই মৃত্যুর প্রতিবাদে বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে কয়েক হাজার মানুষ বেলেঘাটা থানা ঘেরাও করে। বামপন্থী নেতারা মিছিল করে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেন। রাজ্যপালকে যাঁরা স্মারকলিপি দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ইলা মিত্র, প্রশান্ত চ্যাটার্জি (বর্তমানে কলকাতা পুরসভার মেয়র), শৈলেন দে, সুবোধ দে প্রমুখ। তখন লকআপে মৃত্যু সম্বন্ধে কী রকম বিচলিত ছিলেন বামপন্থীরা। পুলিশি

লক আপে একটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেই উদ্বিগ্ন, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন তাঁরা। আর আজ, তাঁদেরই শাসনকালে পুলিশি লক আপে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও বামপন্থী শাসকরা কিন্তু উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হন না।

১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ১৯৭১ সালের ৭ জুলাই জ্যোতি বসু এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে পুলিশি নির্যাতন, থানা লক আপে বন্দি পিটিয়ে খুন এইসব ঘটনার কথা তাঁরা উল্লেখ করেন। জ্যোতি বসু এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে লেখেন, 'আপনি কি জানেন ডি সি (নর্থ) এবং ও সি (জোড়াবাগান)-এর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা শাসক দলের অনুগ্রহভাজন বলে কাজ করে যাচ্ছেন।'

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জমানা বিদায় নিয়েছে। সতের বছর ধরে জ্যোতি বসুই এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বও তাঁর হাতে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, খোদ জ্যোতি বসুর আমলেই পুলিশি নির্যাতন এবং থানা লক আপে বন্দি পিটিয়ে হত্যার ঘটনা কমেনি। বরং বেড়েছে। এবং বিরোধী দলে থাকার সময়ে যে জ্যোতি বসুরা এমন বিষয়গুলি নিয়ে ক্ষুব্ধ এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন, শাসক দলে আসার পর তাঁরা এমন বিষয়ে উদাসীনই হয়ে পড়লেন। থানা লক আপে এই পুলিশি অত্যাচার ও পিটিয়ে মারার ঘটনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তদন্ত ধামা চাপা পড়তে থাকল। দোষী পুলিশদের ট্রান্সফার অথবা সাময়িক বরখাস্তের বেশি আর কোনও শাস্তি হল না। অধিকাংশ পুলিশি অত্যাচারের ঘটনাই কায়দা করে চেপে যাওয়া হল। অথচ ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার আগে বামফ্রন্ট সরকারের হাতে একটি ইস্যু ছিল এই পুলিশি অত্যাচারই।

শুধু থানা লক আপে পিটিয়ে হত্যা নয়। থানা লক আপে ধর্ষণ, আন্দোলন থামাতে পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ, রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর গুলি চালিয়ে রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা, সমাজবিরোধী পুলিশ আঁতাত, রাজনৈতিক চাপের কাছে পুলিশের মাথা নোয়ানো—গত সতের বছরে এই অবনতি ঘটেছে দ্রুত। কাজেই, গত সতের বছরে বামফ্রন্ট সরকার কোন ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি ব্যর্থ হয়েছে যদি এ প্রশ্ন করা হয়, তাহলে আমি বলব—মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার সব থেকে বেশি ব্যর্থ। যে মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে তাঁরা সোচ্চার হতেন, সেই অধিকারসমূহই তাঁদের আমলে পদদলিত হয়েছে সব থেকে বেশি।

সাত

মার্ক্সবাদীদের চরিত্র বদলের প্রসঙ্গটি নিয়ে সত্যিই যদি আজ আলোচনা করতে হয়, তাহলে দেখা যাবে গত সতের বছরে এ রাজ্যে মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে মার্ক্সবাদীদের চরিত্র বদল যতখানি ঘটেছে, অন্য আর কোন ক্ষেত্রেই ততখানি ঘটেনি। গত সতের বছরে এ রাজ্যে মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নটি নিয়েই একটি দীর্ঘ স্বতন্ত্র আলোচনা হতে পারে। তবে সে প্রশ্ন তো আলাদা।

সংক্ষিপ্ত আলোচনাতে দেখা যাবে, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রসঙ্গে বিরোধী থাকার সময়ে যে কথা বলেছিল মার্ক্সবাদীরা, যে যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল, তার সবকটিই তারা লঙ্ঘন করেছে ক্ষমতায় এসে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি অংশ আগের অধ্যায়েই তুলে ধরেছি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই কিভাবে পুলিশ লক আপে বিনাবিচারে বন্দি হত্যা হয়েছে তার কতগুলি তথ্য তুলে ধরেছি। এবং এই প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গিয়ে অন্তত দুটি জিনিষ আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। তা হল, যে পুলিশি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সজাগ ছিল মার্ক্সবাদীরা, ৭৭ সালে নির্বাচনের সময় যে পুলিশি দমন-পীড়নই তাদের বড়ো ইস্যু হয়েছিল, সেই পুলিশি দমন-পীড়ন কিন্তু বামফ্রন্টের সতের বছরেও অব্যাহত রইল। এবং এ নিয়ে মার্ক্সবাদীরা বিরোধী থাকার সময় যতখানি সরব ছিলেন ক্ষমতায় আসার পর ততখানিই নীরব হয়ে গেলেন। দ্বিতীয়ত, আরও একটি জিনিষও ধরা পড়ল। তার কথাও আগে বলেছি। তবু, আর একবার বলে নিই। দমন-পীড়নকারী দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তির দাবিতে বিরোধী থাকার সময় মার্ক্সবাদীরা মুখর হতেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল এইরকমভাবে মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার ক্ষেত্রে যেসব পুলিশ অফিসাররা দোষী সাব্যস্ত হলেন, তাঁদের শাস্তি বিধানের জন্য ক্ষমতাসীন মার্ক্সবাদীরাই কিন্তু কোনও উদ্যোগ দেখালেন না। এমনকি, জরুরি অবস্থার সময়ে যে পুলিশ অফিসাররা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বন্দিদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন, যে নির্যাতনের বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদীরাই সরব ছিলেন সবথেকে বেশি, সেই পুলিশ অফিসারদের শাস্তি বিধানের বিষয়টি ক্ষমতায় আসার পর মার্ক্সবাদীরাই বেমালুম ভুলে গেলেন। বরং, আগেই বলেছি, এই পুলিশ অফিসাররাই গত সতের বছরে মার্ক্সবাদী নেতাদের-মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ হয়েছেন ক্রমশ। বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে শাস্তিবিধানের বদলে এঁদেরই হয়েছে প্রমোশন।

কিন্তু শুধু কি পুলিশি লক আপে হত্যা? গত সতের বছরের বামপন্থী শাসনের মানবিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আরও নানাভাবে পদদলিত হয়েছে। যেভাবে পদদলিত হয়েছে গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকারসমূহ—তার ভিতরে রয়েছে নির্বাচনের সময়ে জনসাধারণকে গায়ের জোরে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, রয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক আন্দোলনের ওপর পুলিশের গুলি চালনা, প্রকাশ্যে রাজপথেই বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা এবং নেত্রীদের আক্রমণ করা প্রভৃতি। এবং মার্ক্সবাদীদের অতীত ঘাঁটলে দেখা যাবে, ক্ষমতায় আসার আগে এই জাতীয় কাজগুলিরই তাঁরা ঘোর বিরোধী ছিলেন।

৭৭ সালে নির্বাচনের সময় পুলিশি দমন-পীড়ন যেমন একটি বড়ো ইস্যু ছিল মার্ক্সবাদী বা বামফ্রন্টের কাছে, তেমনই আর একটি বড়ো ইস্যু ছিল ১৯৭২-এর নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে ফেলার বিষয়টিও। বলতে গেলে, ৭২-এর নির্বাচনের প্রসঙ্গটি এখনও মাঝেমধ্যেই ইস্যু করে তোলেন মার্ক্সবাদীরা। ৭২-এর নির্বাচনে বুথ দখল করে, রিগিং করে, গণতন্ত্রকে পুরোপুরি পদদলিত করে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এসেছিল মার্ক্সবাদীদের এটাই সব থেকে বড়ো অভিযোগ। এটাও ঠিক, ৭২ সালে সত্যিই অনেকগুলি বিধানসভা কেন্দ্রে এই জাতীয় ঘৃণ্য কাজ হয়েছিল। খোদ জ্যোতি বসুর তৎকালীন নির্বাচনী কেন্দ্র বরানগরেই এই

কাজ হয়েছিল। এই রিগিং এবং সন্ত্রাসের প্রতিবাদে জ্যোতি বসু ৭২ সালে ভোটের দিন ভোট শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার আগে গণতন্ত্রকে এভাবে পদদলিত হতে দেওয়া হবে না—এই প্রতিশ্রুতি মার্ক্সবাদীরা তথা বামফ্রন্ট দিয়েছিলেন। ৭৭ সাল থেকে ক্ষমতায় আসার পর এই এখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের সমালোচনা প্রসঙ্গে ৭২ সালের উদাহরণ টেনে এনে কংগ্রেসের হাতে যে গণতন্ত্র নিরাপদ নয়—এমনটিই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন মার্ক্সবাদীরা। দীর্ঘদিন নিজেকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখার পর ৯১ সালে যখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এ রাজ্যে ফের বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে এলেন—তখনও তাঁর বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদীদের প্রচারের প্রধান হাতিয়ারই হয়েছিল ওই ৭২ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গটি।

যাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তাঁরাই ক্ষমতায় এসে তাঁদের আমলে নির্বাচনগুলি এবং নির্বাচনে জনগণের ভোট দানের অধিকারটি সম্বন্ধে কী মনোভাব নিলেন। বামফ্রন্টের আমলে কয়েকটি নির্বাচনের খণ্ডচিত্র তুলে দিই এখানে। ১৯৯০ সালের জুন মাসে কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের কথা সবাই জানেন। ওই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যত হৈ-চৈ এবং সমালোচনার ঝড় বিভিন্নপ্রান্ত থেকে উঠেছিল, তা সাম্প্রতিককালের আর কোনও নির্বাচনকে ঘিরে হয়নি। কী হয়েছিল ৯০ সালের জুন মাসে কলকাতা পুরসভার ওই নির্বাচনে? কলকাতা পুরসভার ওই নির্বাচনে কী হয়েছিল, তার একটু অংশ না হয় তুলে ধরি। নির্বাচনের দিন সকাল দশটা-এগারোটা। বউবাজারের মোড়ে গোয়েঙ্কা কলেজের বুথের সামনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন পড়েছে। হঠাৎ বউবাজারের মোড়ে পরপর কয়েকটা বোমা পড়ল। তারপরই দেখা গেল রিভলভার হাতে নিয়ে কয়েকটি ছেলে বউবাজারের মোড় থেকে গোয়েঙ্কা কলেজের দিকে ছুটে আসছে। ইতিমধ্যে গোয়েঙ্কা কলেজের বুথের সামনে ভোটারদের লাইন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ভোটাররা ভয়ে পালাতে শুরু করেছেন। রিভলভার হাতে নিয়ে একটি ছেলে এগিয়ে এসে অন্যদের উদ্দেশ্য করে বলল—'লাইন ফাঁকা করে দিয়েছি। চলে আয়, চলে আয়।' রিভলভার হাতে ছেলেরা দুদ্দাড় করে বুথে ঢুকে পড়ল। তারপর চলল বুথ দখল করে অবাধে ছাপ্পা-ভোট। ঠিক এই সময়ই কলকাতা পুলিশের এক কর্তা জিপে চড়ে টহল দিতে বউবাজারের মোড়ে এসেছিলেন। কর্তব্যরত সাংবাদিকরা সেই সময় তাঁকে গিয়ে বলেন—'শুনছেন, বউবাজারে দিকে বোমা পড়ছে।' কিছুটা অবাক হওয়ার ভান করে পুলিশ কর্তা বলেন—'কোথায়, কিছু শুনছি না তো।' এরপরই তিনি জিপ ঘুরিয়ে সোজা কলেজ স্ট্রীটের দিকে চলে যান। যে ঘটনাটুকু এখানে তুলে ধরলাম সে ঘটনাটুকু কিন্তু পরদিন কলকাতার সবকটি সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল।

৯০ সালের কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের সময় এরকম ঘটনা চতুর্দিকে ঘটেছিল। বোমা এবং রিভলভার হাতে মস্তানরা রাস্তায় রাস্তায় নেমে তাণ্ডব করছে—এ ছবিও পরদিন কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ হয়েছিল। এবং পরে আরও জানা গিয়েছিল যে, যে মস্তানরা ওভাবে বোমা-পিস্তল হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল তারা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতার মদতপুষ্টই। কিছু মস্তানকে আবার কলকাতার বাইরে

থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বলেও জানা গিয়েছিল। এত কাণ্ড ঘটার পর কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সেদিন বলেছিলেন, 'বউবাজার অঞ্চলে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া আর কোনও গণ্ডগোলই হয়নি নির্বাচনে।'

আর একটি নির্বাচনের খণ্ডচিত্র তুলে ধরি। এটি ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা। নির্বাচনের দিন দুপুরে মধ্য কলকাতার টাকি স্কুলের বুথে ভোটারদের লাইন পড়েছে। স্কুলের বাইরে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে এক পুলিশ অফিসার পাহারাও দিচ্ছেন। স্কুলের ভিতর দোতলায় বুথের সামনে দুজন লাঠিধারী হোমগার্ডও মোতায়েন। ঠিক মতোই ভোট চলছিল। এমন সময়েই হঠাৎ দুদ্দাড় করে উঠে এল কয়েকটি যুবক। তাদের কয়েকজনের হাতে রিভলভার। দোতলায় উঠেই তারা ভোটারদের ধমকে এক কোণায় নিয়ে গেল। যুবকদের হাতে উদ্যত রিভলভার দেখে লাঠিধারী হোমগার্ড দুজনও ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। এরপরই যুবকরা প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে ব্যালট পেপার চাইল। প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপার দিতে অস্বীকার করায়, যুবকেরা তাঁর জামার কলার ধরে চড়-থাপ্পড় মারে। প্রিজাইডিং অফিসারের চোখের চশমা ভেঙে যায়। যুবকরা লাথি মেরে ব্যালট বাক্স নিচে ফেলে দেয়। কিছুক্ষণ এভাবে তাণ্ডব চালিয়ে যুবকরা চলে যায়। এই ঘটনার কথাও পরদিন কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল যুবকদের হাতে মার খাওয়া ক্রন্দনরত প্রিজাইডিং অফিসারের ছবি। প্রিজাইডিং অফিসার কাঁদতে কাঁদতে সাংবাদিকদের এ-ও বলেছিলেন, 'এতদিন কো-অর্ডিনেশন কমিটি করেছি, তবু ওরা আমাকে মারল?' এই 'ওরা' কারা?

৯২ সালে বালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের কথা বলি। এই উপনির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন দিব্যেন্দু বিশ্বাস, আর মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন রবীন দেব। এছাড়া, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা একজন বিক্ষুব্ধ প্রার্থীও ছিলেন স্বপন চক্রবর্তী। বালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের দিন সকাল থেকেই গোটা বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে ব্যাপক সন্ত্রাস এবং মারদাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বালিগঞ্জ কেন্দ্রে কয়েক হাজার ক্যাডার নামিয়ে দেয়। এদের অনেককেই সকাল থেকেই সশস্ত্র অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এমনকি, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এক বিধায়কের গাড়ি চেপে এক কুখ্যাত সমাজবিরোধীকেও টহল মারতে দেখা যায়। সকাল দশটা-এগারোটার ভিতর অধিকাংশ বুথই চলে যায় এইসব সমাজবিরোধী মস্তানদের দখলে। ভোটারদের তাড়া মেরে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিরোধী দলের এজেন্টদের মারধর করে বুথ থেকে তুলে দেওয়া হয়। গোটা ঘটনায় কার্যত পুলিশ দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই রিগিং-এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্বপন চক্রবর্তীর নির্বাচনী এজেন্ট বাদশা আলম পুলিশের হাতে প্রহৃত হন। এই বাদশা আলমও আবার একসময় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। এই ব্যাপক রিগিং এবং সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিরোধীরা দুপুরের ভিতরই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। ওইদিনই বিকেলে গড়িয়াহাটার মোড়ে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে স্বপন চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। পুলিশের গুলিতে যে ওই ব্যক্তি মারা গিয়েছেন পুলিশ প্রথমে এটাই অস্বীকার করে যেতে চেয়েছিল। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি যে জায়গায় পড়েছিলেন বালতি বালতি জল ঢেলে সে জায়গা থেকে

রক্ত ধুয়ে সাফ করে দিতে চেয়েছিল পুলিশ। এমনকি, পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদারও প্রথমে বলেছিলেন, বোমার টুকরোয় ওই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তবে, শেষ পর্যন্ত আর পুলিশ এই ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারেনি। পুলিশকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, তাদের গুলিতেই স্বপন চক্রবর্তীর মৃত্যু ঘটেছিল। এই গোটা ঘটনাই কিন্তু পরদিন কলকাতার সবকটি সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়েছিল।

এই তিনটি খন্ড ঘটনাই কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছে ক্ষমতায় আসার পর মার্ক্সবাদীদের চরিত্রে একটা বিরাট বদল ঘটে গেছে। এবং কোনও হিসেব-নিকেশেই এই বদলকে আর মেলানো যাবে না।

মার্ক্সবাদীদের চরিত্র বদলের এই দিকটি প্রকট করে তুলে ধরবার জন্য আগেই বলেছি, এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার রক্ষার প্রসঙ্গটি তুলে আনা সবচেয়ে ভালো। মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকারখানি কেমন চেহারা পেয়েছে—তা খোলসা করার জন্য আরও কিছু তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরা যাক।

পশ্চিমবঙ্গে এর আগে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারগুলির প্রতি মার্ক্সবাদীদের একটি বড়ো অভিযোগ ছিল, গণতান্ত্রিক আন্দোলন রুখতে যথেচ্ছভাবে পুলিশ ব্যবহার করে কংগ্রেস সরকার। এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর দমন-পীড়নের কাজে পুলিশকে লাগানো হয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আগে মার্ক্সবাদীরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার কাজে অন্তত পুলিশকে আর ব্যবহার করবে না বামফ্রন্ট সরকার। পুলিশকে পীড়নের যন্ত্র হিসেবে আর ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু গোটা চিত্রটা এবারও পাল্টে যায়।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার কাজে পুলিশকে ব্যবহার করা হবে না—মার্ক্সবাদীদের এই প্রতিশ্রুতি কতটুকু রক্ষিত হয়েছে? কয়েকটি হিসেব এবং কিছু ঘটনা তুলে দিচ্ছি। তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে বিষয়টি। প্রাপ্ত হিসেবে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি থেকে ৯২-এর ২১ জুলাই পর্যন্ত এ রাজ্যে বিভিন্ন আন্দোলনের ওপর গুলি চালিয়ে পুলিশ ১৩০ জন মানুষ মেরেছে। এর ভিতরে আবার ৮০-৮২ এই দু'বছরেই শুধু পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন ৬২ জন। ৭৯ থেকে ৯২-এর জুলাই পর্যন্ত ৮২টি জায়গায় পুলিশ গুলি চালিয়েছে।

কী ধরনের ঘটনায় পুলিশ গুলি চালিয়েছে? দেশ বিভাগের ফলে ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাঙালি পরিবারগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল দন্ডকারণ্যে। সেই সময় বিরোধী মার্ক্সবাদীরা চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, এই উদ্বাস্তু বাঙালি পরিবারগুলিকে পশ্চিমবঙ্গেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই দাবিতে বিধানসভায় তাঁরা সরব হয়েছিলেন। সরব হয়েছিলেন বিধানসভার বাইরেও। ৭৭-সালে মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর দন্ডকারণ্যের এই উদ্বাস্তু বাঙালিরা পশ্চিমবঙ্গে এসে পড়লে তখন আবার মার্ক্সবাদী সরকারই জোর করে তাদের ফেরৎ পাঠান। ৭৮-সালে দন্ডকারণ্য থেকে তিরিশ হাজার উদ্বাস্তু এসে বসতি গড়ে তোলেন সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে। কিন্তু মরিচঝাঁপি থেকে এই উদ্বাস্তুদের সরিয়ে দিতে মার্ক্সবাদী সরকার উঠে পড়ে লাগে। এ নিয়ে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মার্ক্সবাদী সরকারের সংঘাতও লাগে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু কলোনিতে রাতের অন্ধকারে আগুন ধরিয়ে

দেওয়া হয়। পুলিশ গুলি চালায় উদ্বাস্তুদের ওপর। পুলিশের গুলিতে ৩৬ জন মারা যান। ৭৭ থেকে এ পর্যন্ত পুলিশের গুলি চালনার এটাই বীভৎসতম ঘটনা।

এরপর আরও নানা ঘটনায় পুলিশ গুলি চালিয়েছে। যে বছর মরিচঝাঁপিতে গুলি চালনার ঘটনা ঘটে সে বছরই অক্টোবর মাসে বন্দর এলাকায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। বিক্ষোভরত শ্রমিকদের মোকাবিলা করতে পুলিশ গুলি চালায়। তাতে পাঁচজন শ্রমিক নিহত হন।

৮৮ সালের ২৮ মার্চ নদীয়ার বাগদিয়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে কৃষকরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। কৃষকদের অভিযোগ ছিল, তাঁরা তাঁদের জমিতে চাষের জল পাচ্ছেন না। ফলে তাঁদের চাষ মার খাচ্ছে। চাষের জলের ব্যবস্থার জন্য বারবার আবেদন জানিয়েও কোনও ফল পাননি তাঁরা। এই চাষের জলের দাবিতেই তাই তাঁরা পথ অবরোধ করেন। কৃষকদের এই পথ অবরোধ হঠাতে এসেই পুলিশ গুলি চালায়। এতে দুইজন কৃষক নিহত হন।

৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গৌরীশঙ্কর জুট মিলে ফের শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। ঘটনাটি এইরকম। ওই জুট মিলের মালিক দীর্ঘদিন ধরেই শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ নায্য পাওনা-গণ্ডা কিছুই দিচ্ছিলেন না। ওইদিন শ্রমিকরা পুজোর মুখে তাদের বকেয়া বেতনসহ নায্য পাওনার দাবিতে কারখানার ভিতরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের এই বিক্ষোভ ক্রমশই মারমুখী হয়ে পড়ে। মালিকপক্ষ পুলিশ তলব করে। পুলিশ জুট মিলের ভিতরে ঢুকে গুলি চালায়। তাতে রাজেশ্বর রাই নামে এক শ্রমিক নিহত হন। পুলিশের এই গুলি চালনার স্বপক্ষে বলতে গিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এবং বর্তমানে সি আই টি ইউ-র রাজ্য সভাপতি নীরেন ঘোষ সেদিন বলেছিলেন, 'পুলিশ গুলি চালিয়ে কোনও অন্যায় করেনি।'

৯০ সালের ৩১ আগস্ট কলকাতায় এস ইউ সি আই-র সমাবেশের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। কলকাতায় তখন বাসট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলি আন্দোলন চালাচ্ছিল। সে আন্দোলনের অন্যতম শরিক ছিল এস ইউ সি আই। এর আগে বিরোধী থাকাকালীন মার্ক্সবাদীরা এ রাজ্যে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এরকম আন্দোলন বহুবার করেছে। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সেই আন্দোলনে মার্ক্সবাদীরা তখন বহু বাসট্রাম পুড়িয়েছে কলকাতার বুকে। যাই হোক, ৯০ সালের ৩১ আগস্ট কলকাতার রাণী রাসমণি রোডে একটি সমাবেশের ডাক দেয় এস ইউ সি আই। ঐদিন আবার শহিদ দিবসও ছিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের শহিদ স্মৃতি ফলকের সামনে থেকে এস ইউ সির মিছিল শুরু হয়ে এসে পৌঁছয় রাণী রাসমণি রোডে। রাণী রাসমণি রোডে এস ইউ সি-র কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ গুলি চালায়। তাতে মাধাই হালদার নামে এক এস ইউ সি কর্মীর মৃত্যু ঘটে। পুলিশের এই গুলি চালনার ঘটনার কিছু পরেই এসপ্ল্যানেড ইস্টে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সে জনসভায় ভাষণ দিতে উঠে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, 'এস ইউ সি ভেবেছিল আন্দোলন নিরামিষ হয়ে যাচ্ছে। তাই কিছুটা আমিষ করে দেওয়া হল।'

ওই বছরই এর দুমাস আগেই গার্ডেনরিচে বাসট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আর

একটি আন্দোলনের ওপরও পুলিশ গুলি চালায়। বাসট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে গার্ডেনরিচে ওই আন্দোলন করছিল কংগ্রেস। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীরা গার্ডেনরিচে পথ অবরোধ করেন। পথ অবরোধ হঠাতে এলে পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ কংগ্রেস কর্মীদের হঠাতে গুলি চালায়। তাতে রঘুনন্দন তেওয়ারী নামে এক কিশোর নিহত হয়। ওই বছর বাসট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলনে প্রথম শহিদ এই রঘুনন্দন তেওয়ারীই।

৯২ সালের নভেম্বর মাসের গোড়াতেই মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া গ্রামে পুলিশ নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর গুলি চালায়। এই হরিহরপাড়া গ্রামের অধিবাসীদের জীবন তার আগে ডাকাত এবং সমাজবিরোধীদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছিলেন, হরিহরপাড়া থানার সঙ্গে ডাকাতদের ভালোরকম যোগ রয়েছে এবং পুলিশের প্রচ্ছন্ন মদতেই ডাকাতরা এসব কাজ করে চলেছে। ওই সময় হরিহরপাড়ায় সাধারণ মানুষের ওপর ডাকাতদের হামলার একটি ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে স্থানীয় মানুষরা হরিহরপাড়া থানা ঘেরাও করে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষও বাধে। গ্রামবাসীদের হঠাতে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে। তাতে সাতজন গ্রামবাসী মারা যান।

৯৩ সালের ২১ জুলাই কলকাতায় প্রদেশ যুব কংগ্রেসের মহাকরণ অবরোধের ওপর গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। মহাকরণ অবরোধ উপলক্ষে ওইদিন মহাকরণে যাবার বেশ কয়েকটি রাস্তায় যুব কংগ্রেস কর্মীরা অবরোধ সৃষ্টি করেছিল। মেয়ো রোড এবং ব্রাবোর্ন রোড এই দুই জায়গায় অবরোধকারী যুব কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে পুলিশের। ব্রাবোর্ন রোডে পুলিশ বেধড়ক লাঠিপেটা করে অবরোধকারীদের। যথেষ্ট টিয়ারগ্যাস ছোঁড়া হয়। ব্রাবোর্ন রোড এবং মেয়ো রোড দু'জায়গাতেই কংগ্রেসের মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়। মেয়ো রোডে শুধু লাঠি বা টিয়ারগ্যাস চালিয়েই শান্ত থাকেনি পুলিশ। এখানে পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালায়। তাতে তের জন নিহত হন। আহত হন বহু। আহতদের মধ্যে নিতান্ত নিরীহ পথচারীরাও ছিলেন। মার্ক্সবাদীদের আমলে কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতেই এরকম বেপরোয়াভাবে গুলি চালানোর ঘটনা আগে ঘটেনি। যাঁরা নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের ভিতর একজন ছিলেন মুরারী চক্রবর্তী। পুলিশের বেপরোয়া গুলি চালনার সামনে পড়ে মুরারী চক্রবর্তী পালিয়েই যাচ্ছিলেন। ধর্মতলার মোড়ে পুলিশ তাঁকে ঘিরে ধরে। মুরারী চক্রবর্তী দুহাত মাথার উপরে তুলে ফেলার পরও পুলিশ তাঁকে ঘিরে ধরে গুলি চালিয়ে মেরে ফেলে। এস এন ব্যানার্জি রোডে একটি মিষ্টির দোকানের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ওই মিষ্টির দোকানের দুই কর্মচারী গণ্ডগোলের ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য করেও পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে দুজনই মারাত্মক আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এইরকমভাবে পুলিশ চালিয়েছিল সেদিন। এই ঘটনার পর পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, যুব কংগ্রেস কর্মীরা পাইপগান, বোমা এবং ভোজালি নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু ওইদিনের ঘটনায় আহত পুলিশদের পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসার রিপোর্টে দেখা গেছে, ইঁটের আঘাত ছাড়া আর কোনও আঘাতই আহত পুলিশ কর্মীদের লাগেনি। এছাড়া ওইদিনের ঘটনায় নিহত, আহত বা ধৃত যুব কংগ্রেস কর্মীদের কাছ থেকেও কোনও অস্ত্রশস্ত্র পায়নি পুলিশ।

৯৪ সালের গোড়ার দিকে উত্তরবঙ্গের কুমারগঞ্জে এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ওপর হামলা চালায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা। মারাত্মক আহত অবস্থায় ওই শিক্ষককে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে আসতে হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্কুলের ছাত্ররা এবং কুমারগঞ্জের সাধারণ মানুষ রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে নেমে পড়েন। এই বিক্ষোভের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। তাতে এক ছাত্র নিহত হয়। এই ৯৪ সালেই বীরভূমের তারাপুরে এক জনপ্রিয় সরকারি চিকিৎসকের বদলিকে কেন্দ্র করেও জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। তারপুরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক চিকিৎসক ওখানকার সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কাজে যথেষ্ট আগ্রহ এবং আন্তরিকতা দেখিয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি দপ্তরের রাজনীতির ফলে তাঁর বদলি হবার আদেশ আসে। এই বদলির আদেশের বিরুদ্ধে তারাপুরের গ্রামবাসীরাই বিক্ষোভ করতে নেমে পড়েন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ভাঙচুর করেন তাঁরা। পুলিশ গ্রামবাসীদের ওপর গুলি চালায়। তাতে তিনজন গ্রামবাসী মারা যান। এই বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে বারাসাতে যুব কংগ্রেসের সমাবেশের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। তাতে একজন মারা যায়। বারাসাতে হাসপাতালের ভিতর অবাধে ঢুকে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। ৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিয়ালদা স্টেশনে পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ বাঁধে। এক বিনা টিকিটের যাত্রীকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ গুলি চালিয়ে এখানে চারজনকে মারে। নিহতদের ভিতরে কলেজের ছাত্রও ছিল।

৯৩ সালে তেলেনিপাড়ার ভিক্টোরিয়া জুট মিলে নায্য পাওনার দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে এখানে পুলিশ এসে গুলি চালায়। গুলিতে কয়েকজন শ্রমিক আহত হন। এরপর উত্তেজিত শ্রমিকরা এক পুলিশ কর্মীকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ভাঙচুর করে মিলের অফিস। উত্তেজিত শ্রমিকদের হাতে প্রহৃত হন স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। এই ঘটনার বদলা নিতে পরদিন রাতে পুলিশ ভিক্টোরিয়া জুট মিলে শ্রমিকদের বস্তিতে হানা দেয়। ভিখারি পাশোয়ান নামে এক শ্রমিককে তুলেও নিয়ে যায় পুলিশ। আজ পর্যন্ত এই ভিখারি পাশোয়ানের কোনও হদিশই পাওয়া যায়নি। সন্দেহ করা হচ্ছে, ভিখারি পাশোয়ানকে মেরে পুলিশ তার লাশ গায়েব করে দিয়েছে।

গত সতের বছরে পুলিশের গুলি চালনার অজস্র ঘটনাগুলি থেকে কয়েকটি তুলে দিলাম। যে ঘটনাগুলি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তুলে দিলাম সেই ঘটনাগুলিকেই। এই ঘটনাগুলি থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, গত সতের বছরে গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে মার্ক্সবাদীরা কী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে এই রাজ্যে। গত সতের বছরে গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন মোকাবিলায় কী ঘটনা ঘটে গেছে এই রাজ্যে।

গত সতের বছরে মার্ক্সবাদীদের আমলে পুলিশ এবং সেই পুলিশ ব্যবহারে মার্ক্সবাদীদের ভূমিকা নিয়েই একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনা করে ফেলা যায়। ৭৭ সালের আগে পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের দমন-পীড়ন সম্বন্ধে যে মার্ক্সবাদীরা সোচ্চার ছিল, তারাই গত সতের বছর কীভাবে ব্যবহার করেছে পুলিশকে তাও কিন্তু এই ঘটনাগুলির ভিতর দিয়েই পরিষ্কার। এই লক আপে মৃত্যু এবং পুলিশের গুলি চালনার ঘটনা তো আছেই। কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। পাশপাশি, এই মার্ক্সবাদীদের আমলেই পুলিশি হেপাজতে নারী নির্যাতনের অজস্র ঘটনাও রয়েছে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ৮২ থেকে

৯২-এর ভিতর এ রাজ্যে পুলিশি হেপাজতে ৪২টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এই নির্যাতনের ভিতর পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর খুন এরকম ঘটনাও ঘটেছে। মায়াহারি পুলিশ আউট পোস্টে কল্পনা প্রামাণিক নামে বারো বছরের এক কিশোরীর ওপর বলাৎকার করা হয়েছিল। ৮৫ সালের জুন মাসে জয়নগর থানার এক মহিলা পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিতা হন। পরে তাঁকে খুনও করা হয়। ৮৮ সালে রিজেন্ট পার্ক থানায় শাশ্বতী ঘোষ নির্যাতিতা হন পুলিশের হাতে। ৮৪-র অক্টোবরে চুঁচুড়া থানা ব্যারাকে পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিতা হন মঞ্জু চক্রবর্তী। ৯২ সালে ফুলবাগানে নেহারবানুকে ঝুপড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে থানার ভিতরেই ধর্ষণ করা হয়। এইরকম ঘটনা অজস্র ঘটেছে।

৭৭ সালের আগে জরুরি অবস্থার সময় অসীমা পোদ্দার নামে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এক মহিলা কর্মীকে বেলেঘাটা থানায় ধরে এনে লক আপে ধর্ষণ করা হয়। জরুরি অবস্থার পরে, ৭৭ সালে নির্বাচনের সময় এই ধর্ষণের ঘটনাকেই কিন্তু ইস্যু করেছিল মার্ক্সবাদীরা। সেই সময় মার্ক্সবাদীদের প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় হাজির করা হত অসীমা পোদ্দারকে। তাঁর ধর্ষিতা হবার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। অথচ এই মার্ক্সবাদীদের আমলেই থানা লক আপে এতজন মহিলার ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে গেলেও কিন্তু মার্ক্সবাদীদের কোনও ভাবান্তরই লক্ষ্য করা যায়নি। তার চেয়েও দুঃখজনক হচ্ছে অর্চনা গুহের ঘটনাটি। জরুরি অবস্থার সময় পুলিশি হেপাজতে অর্চনা গুহর ওপর বীভৎস অত্যাচার হয়েছিল। এক কুখ্যাত পুলিশ অফিসার এই অত্যাচার চালিয়েছিলেন। অর্চনা গুহর বুকে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে ব্যঙ্গ করে ওই পুলিশ অফিসার বলেছিলেন-'মালা পরিয়ে দিলাম।' এই অত্যাচারের ফলে অর্চনা গুহ সারাজীবনের জন্যই পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু, এই মার্ক্সবাদী সরকারের আমলেই নির্যাতনকারী ওই পুলিশ অফিসারটির ভাগ্যে প্রোমোশন জুটেছে।

তাহলে, সতের বছরের এই ঘটনাগুলির ভিতর দিয়ে কী প্রমাণ হচ্ছে? প্রমাণ হচ্ছে যে, ক্ষমতায় আসার আগে পুলিশ প্রশাসনের যে চরিত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন মার্ক্সবাদীরা, সতের বছর ক্ষমতায় থাকার পরও পুলিশ প্রশাসনের সেই চরিত্রটি বদল করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছেন বলেই, থানা লক আপে হত্যা, ধর্ষণ, রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর গুলি চালানোর মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে।

যে রিগিং এবং বুথ দখলের ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন মার্ক্সবাদীরা, তাঁদের কাছে যা ছিল গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করার সামিলই—গত সতের বছর ক্ষমতায় থাকার পর সেই কাজটি কিন্তু তাঁরাও করে ফেলেছেন। করে ফেলেছেন নির্দ্বিধায় এবং নিঃসঙ্কোচে। এরই পাশাপাশি, পুলিশের গণতন্ত্র বিরোধী ঘৃণ্য আচরণের সাফাই গাইতেও এগিয়ে এসেছেন ক্ষমতাসীন মার্ক্সবাদীরা। ক্ষমতাসীন মার্ক্সবাদীদের সমর্থন ব্যতীত যে পুলিশের পক্ষে এই আচরণ করা সম্ভব নয়—এটাও তো সবাই বোঝেন।

আর এগুলিই কি বলে দিচ্ছে না, মার্ক্সবাদী চরিত্রেও বদল ঘটেছে?

ক্ষমতায় আসার আগে মার্ক্সবাদীদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ৩১ ও ৩২ (ক) ধারায় কিন্তু অন্য কথা বলা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, এভাবে দমন-পীড়নকারী দোষী পুলিশ কর্মী এবং অফিসারদের তদন্ত কমিশন গঠন করে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু

মার্ক্সবাদীদের চরিত্র বিচার করতে বসলে দেখা যাবে, ক্ষমতায় আসার পর এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তাঁদের কাছে তামাদি হয়ে পড়ল। বরং, বিরোধীদের দমন-পীড়নের কাজে যথেচ্ছ ভাবে পুলিশকে ব্যবহার করতে শুরু করলেন তাঁরাই। কিভাবে পুলিশকে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা তো আগেই বলেইছি। আর এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তামাদি হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দমন-পীড়নকারী দোষী পুলিশ কর্মী ও অফিসাররাও পার পেয়ে গেলেন। এই পুলিশ অফিসার এবং কর্মীরা রাতারাতি তাঁদের জামা বদলে মার্ক্সবাদীদের বড়ো সহায় হয়ে গেলেন। এর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার আগে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীদের উপর দমনপীড়ন এবং অত্যাচার চালিয়ে সবিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন কলকাতা পুলিশের অফিসার রুনু গুহনিয়োগী। মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর সেই রুনু গুহনিয়োগীই মার্ক্সবাদী নেতা-মন্ত্রীদের বড়ো ভরসা হয়ে দাঁড়ালেন। কাজেই, যতই দমনপীড়ন চালান না কেন, তদন্ত কমিশনের সামনে আর রুনু গুহনিয়োগীকে দাঁড়াতে হল না। বরং, মার্ক্সবাদী সরকারের আমলেই প্রমোশন পেয়ে তিনি কলকাতা পুলিশের অ্যাসিটান্ট কমিশনার হলেন। রুনু গুহনিয়োগী মাত্র একটি উদাহরণ। পার পেয়ে যাওয়া এরকম পুলিশ অফিসার আরও অসংখ্য আছেন।

ক্ষমতায় আসার আগে যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মার্ক্সবাদীদের, ক্ষমতায় আসার পর মার্ক্সবাদীদের ওপর তলা থেকে নিচের তলা পর্যন্ত সেই দৃষ্টিভঙ্গীই আমূল বদলে গেল। বদলে গেল সর্বক্ষেত্রেই। এক নতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করলেন মার্ক্সবাদী শাসকরা।

জরুরি অবস্থার প্রাক্কালে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনমত সংগঠন করার কাজে নেমেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। জয়প্রকাশ কলকাতাতেও এসেছিলেন। কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের সামনে জয়প্রকাশের সভা ঘিরে নক্কারজনক কাণ্ড ঘটেছিল তখন। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের সামনে জয়প্রকাশের গাড়ি আটকে তাণ্ডব করেছিল কংগ্রেস সমর্থকরা। জয়প্রকাশের গাড়ির ওপর তারা নেচেছিল। সভা না করতে পেরে লাঞ্ছিত অপমানিত জয়প্রকাশকে ফিরে যেতে হয়েছিল সেদিন। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে অবশ্যই সোচ্চার হয়েছিলেন সেদিন মার্ক্সবাদীরা। এবং কংগ্রেসের এইসব কাজকর্মগুলিই কিন্তু পরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারের বড়ো অস্ত্র হয়ে ফিরে এসেছিল বামপন্থীদের হাতে। অবশ্য জরুরি অবস্থা ঘোষিত হবার পর জ্যোতি বসুর মতো মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতাকেই কোনও হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। বরং, জ্যোতি বসুর মত গ্ল্যামারসম্পন্ন মার্ক্সবাদী নেতা জরুরী অবস্থার দিনগুলিতে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে তদানীন্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পাশে বসে টেবিল টেনিস খেলা দেখে সময় কাটিয়েছিলেন।

দেশব্যাপী জরুরি অবস্থার সময় অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারও প্রেস সেন্সরশিপ চালু করেছিল। তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল মহাকরণে প্রেস কর্ণারের দরজায়। এক কংগ্রেসি মন্ত্রী সেদিন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আপনাদের তো কবজি থেকে হাত কেটে নেওয়া উচিত।' জরুরি অবস্থা চলাকালীন তিন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার এই চেষ্টাও মার্ক্সবাদীদের সমালোচনার বিষয়বস্তু ছিল এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেস বিরোধী প্রচারে এটাও তাঁদের একটা মস্তো হাতিয়ার হয়েছিল।

৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও একই। বিরোধী থাকার সময় তাঁরা অনেক কথাই বলেছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষমতায় এসে তাঁরা মোটেই গণতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশয় দিতে রাজি হলেন না। বরং, এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাকেই শ্রেয় মনে করলেন তাঁরা।

মার্ক্সবাদী নেতা এবং ক্যাডাররা গণতন্ত্রকে কিভাবে দলিত করলেন দুপায়ে? গত সতের বছরের মাত্র কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরছি। ১৯৯০ সালের ১৬ আগস্ট রাজ্যব্যাপী বারো ঘণ্টার বন্ধ ডেকেছিল বিরোধী কংগ্রেস। কংগ্রেসের ডাকা ওই বন্ধে অভূতপূর্ব সাড়াও পাওয়া গিয়েছিল। বন্ধের আগের দিনই মার্ক্সবাদী নেতারা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, এই বন্ধ রুখতে তাঁদের ক্যাডাররা সক্রিয়ভাবে ময়দানে নামবেন। ১৯৯০ সালের ১৬ আগস্ট তাই নেমেওছিলেন ক্যাডাররা। কলকাতার প্রতিটি বড়ো রাস্তার মোড়ে সেদিন ঝাণ্ডা লাগিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডাররা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় সকাল থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। বেলা দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ে কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেদিন একটি বিশাল মিছিল আসে। মিছিলটি হাজরার মোড়ে পৌঁছন মাত্রই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডাররা সশস্ত্র অবস্থায় মিছিলটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্যাডারদের হাতে লোহার রড, মোটা ডান্ডা এবং রিভলভার ছিল। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডারদের এই হামলায় কংগ্রেসের মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। প্রকাশ্য রাজপথে ক্যাডাররা রাজ্য কংগ্রেসের প্রথম সারির নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে ধরে প্রহার করতে শুরু করে। লোহার রড দিয়ে মাথার পিছনে বেধড়ক ভাবে মারা হয় তাঁকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কংগ্রেস নেত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরপরই এলাকায় যেসব দোকান বন্ধ ছিল, সেগুলির ওপর হামলা চালায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডাররা। রিভলভার উঁচিয়ে পথচারীদের তাড়া করা হয়। সংবাদপত্র এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরও বেধড়ক মারধর করা হয়। কংগ্রেসি জমানায় জরুরি অবস্থার মতো সময়েও কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির কোনও নেতা বা নেত্রীকে এভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় শাসক দলের কর্মীদের হামলার শিকার হতে হয়নি।

সংবাদপত্র এবং সংবাদমাধ্যমকে কিন্তু গত সতের বছরে অহরহই শাসক মার্ক্সবাদীদের রক্তচক্ষুর সামনে পড়তে হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেস সেনসরশিপ চালু হয়নি বটে মার্ক্সবাদীদের জমানায়, কিন্তু জরুরি অবস্থার সময় যেমন মহাকরণের প্রেস কর্ণারটিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তেমনই এঁরাও মহাকরণের প্রেস কর্ণারটি ভেঙে দেওয়ার মতো কাজটিও করেন।

৯২ সালের জানুয়ারি মাসে নদীয়া থেকে একটি মূক এবং বধির মেয়ে দীপালি বসাককে সঙ্গে করে নিয়ে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন রাজ্য কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মূক এবং বধির মেয়েটিকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় এক নেতা ধর্ষণ করেন। ফলে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। কিন্তু ওই নেতাটি এবং তার সঙ্গীসাথীরা মেয়েটির পরিবারের লোকদের ঘটনাটি একদম চেপে যাওয়ার জন্য শাসায়। ওই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর কানে এই ঘটনার কথা পৌঁছলে তিনি মেয়েটি এবং তাঁর মাকে সঙ্গে

নিয়ে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানাতে আসেন। মমতার সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে থাকা সত্ত্বেও সেদিন কংগ্রেস নেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃত হন। মুখ্যমন্ত্রীকে কংগ্রেস নেত্রীর সঙ্গে দেখা না করার পরামর্শ দেন তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণের প্রতিবাদে কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গীরা মহাকরণের করিডোরেই বসে পড়েন। তাঁরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যতক্ষণ না তাঁদের সঙ্গে দেখা করছেন, ততক্ষণ তাঁরা এখান থেকে যাবেন না। এরপরই তথ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এক বিরাট পুলিশবাহিনী মহাকরণে ঢোকে। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে আসেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার গৌতম চক্রবর্তী। এই ডেপুটি কমিশনার আবার মার্ক্সবাদী নেতাদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। লাঠিধারী এই পুলিশবাহিনী মহাকরণে ঢুকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের চুলের মুঠি ধরে করিডোর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মমতা সেইসময় পুলিশকর্মীদের বলেন, তিনি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে এরকম আচরণ করা যায় না। সে কথায় পুলিশ কোনরকম কান দেয়নি। বরং মমতা এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি লেগে যায়। লাঠিপেটা করতে করতে পুলিশ মমতা এবং সঙ্গীসাথীদের লালবাজারে নিয়ে যায়। এই ঘটনা যখন ঘটছিল, তখন কর্তব্যরত সাংবাদিক এবং আলোকচিত্রীরাও আক্রান্ত হন। মহাকরণের দরজা বন্ধ করে দিয়ে কর্তব্যরত সাংবাদিক এবং আলোকচিত্রীদেরও পুলিশ লাঠিপেটা করে। এই ঘটনার পর কর্তব্যরত সাংবাদিকরা ক্ষোভ জানাতে শুরু করলে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সাংবাদিকদের মুখের সামনে আঙুল তুলে রীতিমতো ধমকের সুরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা এখানে কেন? আপনাদের তো ঘর (প্রেস কর্ণার) রয়েছে। সেখানে যান।' এই ঘটনার পর সাংবাদিকরা প্রতিবাদ জানিয়ে মহাকরণ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এবং সিদ্ধান্ত নেন, রাজ্য সরকারের সমস্ত অনুষ্ঠান তাঁরা বয়কট করবেন। বয়কট করবেন মহাকরণও।

লালবাজারেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের বেধড়ক পেটায় পুলিশ। মাঝরাতে একদল পুলিশ বেপরোয়া ভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের পেটাতে পেটাতে রাস্তায় বের করে দেয়।

মহাকরণে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের ওই হামলার প্রতিবাদে এর দুদিন পরে কলকাতায় একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করেন সাংবাদিকরা। আর ওইদিনই মহাকরণে সাংবাদিকদের জন্য নির্ধারিত জায়গা প্রেস কর্ণারটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিনের পুরনো এই প্রেস কর্ণারটি, যা কিনা জরুরি অবস্থার সময়ও ভেঙে দেবার সাহস দেখায়নি কংগ্রেস সরকার, বিনা জরুরি অবস্থাতেই সে কাজটি মার্ক্সবাদীরা এভাবেই সম্পন্ন করল।

গণতন্ত্র এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্ক্সবাদীরা যতই সরব থাকুন না কেন—গত সতের বছরে এটুকু বোঝা গেছে, নিজেদের প্রয়োজনের বেশি গণতন্ত্র বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কোনটাই তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। সেকারণেই জয়প্রকাশের ওপর হামলার বিরোধিতা করে গণতন্ত্র রক্ষা করার কথা ততক্ষণই তাঁরা বলেন, যতক্ষণ তা তাঁদের প্রচারের পক্ষে অস্ত্র হয়। কিন্তু, সেই কাজটি হাসিল হয়ে যেতেই প্রকাশ্য রাজপথে বিরোধী রাজনৈতিক নেত্রীকে নৃশংসভাবে প্রহার বা

মহাকরণে পুলিশ ডেকে এনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে লাঞ্ছনা করার মতো কাজ করতেও তাঁরা আবার দ্বিধা করেন না। জরুরি অবস্থার সময় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ বা শাসক থাকার সময়ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার প্রেস বিলের বিরোধিতা করেন যে মার্ক্সবাদীরা—সেই মার্ক্সবাদীরাই সংবাদপত্র তাঁদের বিপক্ষে গেলে প্রেস কর্ণার ভেঙে দিতেও কসুর করেন না।

প্রেস কর্ণার ভেঙে দেওয়ার ঘটনাটি ছিল সংবাদপত্র এবং সংবাদমাধ্যমের ওপর চরম আঘাত। কিন্তু সংবাদপত্র এবং সাংবাদমাধ্যমকে ক্ষমতায় আসার পর বরাবরই রক্তচক্ষু দেখিয়ে গেছেন মার্ক্সবাদীরা। বিভিন্ন জনসভায় জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ছোট বড় অনেক নেতাই সংবাদপত্র এবং সংবাদমাধ্যমের নাম করে কটূক্তি করেছেন। এতে উল্লসিত হয়ে অনেক সময়ই ক্যাডাররা হামলা চালিয়েছে সাংবাদিক-আলোকচিত্রীদের ওপর। কলকাতায়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের উপস্থিতিতেই এভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে দূরদর্শনের কর্মীদের। ৯০ সালে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের সময় বউবাজার এলাকায়, বেলেঘাটা অঞ্চলে গণ্ডগোলের সময়, বা এর আগে পরে অনেক ঘটনায় সাংবাদিকরা নানাভাবে হেনস্থা হয়েছেন। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে সেসব ঘটনা জানানোও হয়েছে অনেকবার বামফ্রন্ট সরকারের তথ্যমন্ত্রীকে। তথ্যমন্ত্রী 'আশ্বাস' দেওয়া ছাড়া কিছুই করেননি।

এইসব ঘটনাগুলি থেকেই গণতন্ত্র সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং গণতন্ত্র রক্ষায় তাঁরা কতখানি আগ্রহী তা যথেষ্ট বোঝা যায়। তবু আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। তাহলে শাসক মার্ক্সবাদীদের চরিত্রটি আরও পরিষ্কার হবে।

বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তর ৯২ সালের নভেম্বর মাসে মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় কলকাতার শিশির মঞ্চে। ওই আলোচনা সভায় সকলের প্রবেশ অবাধ এই নোটিশও দেওয়া হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু মানবাধিকার সংক্রান্ত ওই আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়ে কোনরকম প্রশ্ন করে যাতে সরকারকে কেউ অস্বস্তিতে ফেলতে না পারেন তার জন্যও সরকারের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তার জন্যই অবাধ প্রবেশের আমন্ত্রণ জানালেও অধিকাংশ প্রবেশ পত্রই আগেভাগে সংগ্রহ করে রাখে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর। এবং আলোচনা সভার দিন প্রেক্ষাগৃহের অধিকাংশ আসনই ভর্তি করে রাখেন সাদা পোশাকের পুলিশ কর্মীরা। এমনকি, মানবাধিকার সংক্রান্ত ওই আলোচনা সভায় প্রেক্ষাগৃহের বাইরে মজুত রাখা হয় পুলিশ ভ্যানও। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, রাজ্য মহিলা কমিশনের বর্তমান চেয়ারপার্সন বেলা দত্তগুপ্ত প্রমুখ। মানবাধিকার রক্ষা সমিতির কয়েকজন সদস্য ওই আলোচনা সভায় প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করে ঢুকেছিলেন। আলোচনা সভায় তাঁরা কিছু প্রশ্নও উত্থাপিত করেন। এতেই গণ্ডগোল বেঁধে যায়। তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে তাঁদের দিকে ছুটে যান। ছুটে আসেন সাদা পোশাকের পুলিশরাও। মানবাধিকার রক্ষা সমিতির সদস্যদের পুলিশের সাহায্য নিয়ে জোর করে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গী!

গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কী চোখে দেখেছে তা আরও

পরিষ্কার হবে হাওড়া জেলার কান্দুয়া গ্রামের ঘটনা তুলে দিলে। গত ৯১ সালের নির্বাচনে হাওড়া জেলার কান্দুয়া গ্রামের বেশ কয়েকটি পরিবার কংগ্রেসকে ভোট দেয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যখন নির্বাচন হচ্ছে, তখন গণতন্ত্র সম্মতভাবেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেশের প্রতিটি নাগরিকের আছে। কিন্তু হাওড়া জেলার কান্দুয়া গ্রামের ওই অধিবাসীদের এই মত প্রকাশের স্বাধীনতাটুকু থাকা ভালো লাগেনি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের। আর তাই, ভোটের পর কান্দুয়া গ্রামের ওই পরিবারগুলির ওপর হামলা চালায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা। তাঁদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় । লুঠপাট চালায়। এবং সর্বশেষ যা করে তা চূড়ান্ত অমানবিক। কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অপরাধে ওই পরিবারগুলির কয়েকজন সদস্যের হাতের পাঞ্জা কেটে নেওয়া হয়। একজন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের প্রতি এই হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন! কান্দুয়া গ্রামের এই ঘটনাটি নিয়ে সেই সময় যথেষ্ট হৈ-চৈ হয়েছিল।

শুধু কান্দুয়া কেন, মেদিনীপুর, দুই চব্বিশ-পরগণা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় মতপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি করার এমন বহু ঘটনা রয়েছে। মেদিনীপুরের দাঁতনে, সবং-এ, পিংলায়, কেশিয়াড়িতে শুধুমাত্র বিরোধী কংগ্রেস দলকে সমর্থন করার জন্য বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্ষেতের ধান নষ্ট করা হয়েছে, পুকুরের জলে ফলিডল মেশানো হয়েছে—এমন ঘটনা ঘটেছে অনেক। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুই চব্বিশ-পরগণাতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। কখনও কখনও এসব ঘটনা সংবাদপত্রের মাধ্যমে নজরে এসেছে। কখনও তা অন্তরালেই থেকে গিয়েছে। শুধু কংগ্রেস কেন, বামফ্রন্টের অন্য শরিকদের সমর্থকদের ওপরও এই ধরনের আঘাত এসেছে।

গণতন্ত্রকে এভাবে স্তব্ধ করতে গিয়ে গ্রামে অন্তত মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা একধরনের সায়েনটিফিক টেররিজম বা বৈজ্ঞানিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। কী সেই সন্ত্রাস? সেই সন্ত্রাস হচ্ছে ভয় পাইয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া। সরাসরি মারধর না করে, মাঠের ধান কেটে নিয়ে, ধোপা-নাপিত বন্ধ করিয়ে, পুকুরের জলে ফলিডল মিশিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা, যাতে সরাসরি মুখ খুলে বিরোধিতা করার সাহসটি কেউ না পায়। আর সে কাজে গ্রামাঞ্চলে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা কিন্তু সফলই হয়েছে। গ্রামে অন্তত তাদের এই সন্ত্রাসের কাছে সাধারণ মানুষকে মাথা নোয়াতে হয়েছে। বিরোধিতা করতে গেলে কী হবে তা তো কান্দুয়ার ওই পরিবারগুলিকেই বুঝিয়ে দিয়েছে তারা।

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই গণতন্ত্রকে দেখছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি।

৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম পাঁচবছর, অর্থাৎ ১৯৮২ সাল পর্যন্ত মার্ক্সবাদীদের আচরণ কিন্তু এতটা পরিবর্তন হয়নি। বরং, বামশাসনের সতের বছরের খতিয়ান দেখলে এটুকু বলা যায়, শাসন ক্ষমতায় আসার প্রথম পাঁচ বছর অন্তত মার্ক্সবাদীরা তাদের সেই পুরনো ইমেজটিই ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিল। ক্ষমতায় আসার প্রথম পাঁচবছরে মার্ক্সবাদীদের দেখে জনগণের তাদের সম্পর্কে গড়ে ওঠা পুরনো ধারণাগুলি বদলে যায়নি। প্রথম পাঁচবছরে মার্ক্সবাদীদের দেখে সাধারণ মানুষ বরং এটাই ভেবেছিল, ক্ষমতার সুবাদে এদের অন্তত চরিত্র বদল ঘটবে না। কিন্তু বদলটা ঘটতে লাগল ৮২ সালের নির্বাচনের পর থেকে। ৮২ সালের নির্বাচনে জিতে দ্বিতীয়বার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্রুত বদল ঘটতে লাগল

মার্ক্সবাদীদের চরিত্রে। বলতে গেলে, ৮২ সালের পর থেকেই অতি দ্রুত মার্ক্সবাদীদের চরিত্র আমূল বদলে গেল।

মার্ক্সবাদীদের এই চরিত্র বদলে গত সতের বছরে গণতন্ত্র কিন্তু শুধু বাইরে বিঘ্নিত হয়নি। গণতন্ত্র বিঘ্নিত হয়েছে খোদ শাসক বামফ্রন্টের ভিতরেও। গত সতের বছরে বামফ্রন্টের অভ্যন্তরেও আর গণতন্ত্র বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। ৭৭ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে লড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ছোটবড় বামপন্থী দলগুলি মিলেমিশে এই বামফ্রন্টের জন্ম দিয়েছিল। বামফ্রন্টের নেতৃত্ব দিতে তখন এগিয়ে এসেছিল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। ৭৭ সালে অবশ্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই ফ্রন্টেই ছিল না। কেননা, জরুরি অবস্থার সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল কংগ্রেসের শরিক। পরে অবশ্য, কংগ্রেসের বিপর্যয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এসে ভেড়ে এই বামফ্রন্টে। অবশ্য ততদিনে এ রাজ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিতটাই ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। স্বাভাবিক কারণেই তাই ৭৭ সালে বড় শরিক হিসেবে বামফ্রন্টের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব বর্তায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ওপর। ৭৭ থেকে ৯৪ এই সতের বছরে ফ্রন্টের বড় শরিক হিসাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বড়, আরও বড়ই হয়েছে। এবং এই সতের বছরে তারা এতটাই বড় হয়েছে যে, বামফ্রন্টকে কার্যত তারাই গ্রাস করেছে। বামফ্রন্ট এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কার্যত সমার্থক হয়ে গেছে। সতের বছর পরে এখন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তই বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত।

অবশ্য, ফ্রন্টের এই অবস্থা হওয়ার জন্য শরিক দলগুলিও দায়ী। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির চাপের কাছে তারা অতি সহজেই মাথা নুইয়ে দিয়েছে। এবং ফ্রন্টের ভিতরে জোরালো কণ্ঠে কখনই তারা তাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। আর এই সুযোগটাই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নিয়েছে। মন্ত্রিত্বে থাকার সুবাদে শরিকরা যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছে, যে বিলাসে অভ্যস্থ হয়েছে—তা যে চট করে ছেড়ে যেতে পারবে না তা বুঝেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রটিকে গ্রাস করেছে। শরিকদের কণ্ঠরোধ করেছে। নিজের সিদ্ধান্তই ফ্রন্টের সিদ্ধান্ত বলে শরিকদের ওপর চালিয়ে দিয়েছে। এবং, সত্যি সত্যিই এরপরও মন্ত্রিত্বের মোহ কাটিয়ে শরিকরা বের হয়ে আসতে পারেনি ফ্রন্ট থেকে। ফ্রন্টকে যে এভাবেই কুক্ষিগত করা যাবে তা কিন্তু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত বলতেন, 'লাল বাতি আর গাড়ি ছেড়ে সব যাবে কোথায়?' ৭৭ সালে ফ্রন্ট সৃষ্টি করার পর তাই ধীরে ধীরে বড় মাছের মতো মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গিলে খেয়েছে তার শরিকদের।

ফ্রন্টের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র বলতে আর কিছুই যে অবশিষ্ট নেই—সেখানে যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কথাই শেষ কথা তা ফ্রন্টের শরিকরা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে। বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অন্যতম প্রবীণ সদস্য এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নেতা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এই মনোভাবকে 'সোশাল ফ্যাসিস্ত' বলে প্রকাশ্যেই আখ্যা দিয়েছিলেন। এই ৯৪ সালেরই সেপ্টেম্বর মাসে কোনও শরিকদের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করে রাজ্য বিধানসভায় যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী শিল্পনীতি সংক্রান্ত ঘোষণা করেছিলেন, তা ফ্রন্টের রীতিবিরুদ্ধ বলেই মনে করেছিলেন বিপ্লবী

সমাজতন্ত্রী দলের নেতারা। এই বছরই অক্টোবর মাসে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির বৈঠক থেকে, জেলায় জেলায় শরিকদের প্রতি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আক্রমণাত্মক মনোভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। অবিলম্বে ফ্রন্টের বৈঠক ডাকতেও বলা হয়েছিল। বামফ্রন্টের বৈঠকও যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মর্জিমতো হয়—সে ব্যাপারে শরিকদের ভিতর নানা ক্ষোভ রয়েছে। জেলায় জেলায় বামফ্রন্ট কমিটি বা রাজ্যস্তরে বামফ্রন্ট কমিটির বৈঠক নিয়মিত হয় না—এ নিয়ে শরিক নেতারা বহুবার প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন। কিন্তু সেই ক্ষোভে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা কোনও কর্ণপাতই করেননি।

শরিক দলগুলির নেতাদের প্রতি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের কী দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছে তাও একটা ঘটনা দিয়ে তুলে ধরি। ফ্রন্টের এক শরিক দলের এক প্রবীণতম নেতার কাছে এই ঘটনাটি শোনা। শরিক দলের এই নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে কারান্তরালে ছিলেন। মার্ক্সবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়েছিলেন। বামপন্থী আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সারাজীবন কমিউনে অতিবাহিত করেছেন। একসময় দলের পক্ষ থেকে তিনিই রাজ্য বামফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করতেন। কিন্তু এখন আর ফ্রন্টের বৈঠকে যান না। কেন যান না, তার পিছনে একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি কী?

ঘটনাটি এইরকম। রাজ্য বামফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে ওই নেতা একদিন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সদর দপ্তরে পৌঁছেছেন। উনি যখন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে ঢুকছেন, ওই একই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও এসে পৌঁছেছেন পার্টি অফিসে। জ্যোতি বসুকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে প্রবীণ নেতাটি সেদিন এগিয়ে গিয়েছিলেন সৌজন্য বিনিময় করতে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সৌজন্য বিনিময় করার জন্য সময় খরচ করতে রাজি ছিলেন না। শরিক নেতার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কোনরকম কথাবার্তা না বলেই মুখ্যমন্ত্রী গটমট করে পার্টি অফিসে ঢুকে গিয়েছিলেন। শরিক নেতা এতে যথেষ্ট ব্যথিত এবং দুঃখিত হয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি আর কোনদিনই ফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে যাননি। শরিক নেতাটি তাঁর ঘনিষ্ঠদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর এ আচরণে ক্ষোভ প্রকাশও করেছিলেন। এই শরিক নেতাটির নাম এখনই উল্লেখ করা যাবে না।

শুধু যে রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেই মার্ক্সবাদীদের এভাবে পরিবর্তন ঘটল তা নয়। ক্ষমতায় আসার পর পরিবর্তন ঘটল মার্ক্সবাদীদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাতেও। এবং এ পরিবর্তনও ঘটল খুবই চোখে পড়ার মতো। এক্ষেত্রেও, ৮২ সালের পর থেকেই এই পরিবর্তন ঘটতে লাগল। মার্ক্সবাদীদের অনাড়ম্বর, সাদাসিধে, নীতিনিষ্ঠ যে জীবনযাপন দেখতে অভ্যস্ত ছিল সাধারণ মানুষ, সেই মার্ক্সবাদীরাই যেন হারিয়ে গেল মানুষের চোখের সামনে থেকে। তার জায়গায় জন্ম নিতে লাগল নব্য মার্ক্সবাদীরা। আড়ম্বরপূর্ণ, ন্যায়নীতির বালাইহীন, দাম্ভিক এই নব্য মার্ক্সবাদীরা সাধারণ মানুষের সামনে ছোটখাটো জমিদারদের মতো আত্মপ্রকাশ করল। একসময়ে কংগ্রেসি নেতা-মন্ত্রীদের কেন্দ্র করে যে যে অভিযোগ উঠত—মার্ক্সবাদীদের কেন্দ্র করে সেইসব অভিযোগ উঠতে শুরু করল। তাঁদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, তাঁদের আয়ের উৎস, তাঁদের সঙ্গে নানা সমাজবিরোধীদের আঁতাত নিয়ে সাধারণ মানুষের ভিতর প্রশ্ন দেখা দিল। এবং একথাও

ঠিক, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতই, দেখা গেল, মার্ক্সবাদী নেতারা যেন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেলেন রাতারাতি। ব্যক্তিগত চরিত্রের এই পরিবর্তন সাধারণ মানুষের থেকে মার্ক্সবাদী নেতাদের অনেক দূরে সরিয়ে দিল।

রাজনৈতিক চিন্তাধারার ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে মার্ক্সবাদীদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের পরিবর্তনেরও কোথায় যেন একটা সংযোগ সূত্র রয়ে গেছে। একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মার্ক্সবাদীদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনে যত পরিবর্তন ঘটেছে, ততই পুরনো প্রতিশ্রুতিগুলি তামাদি হয়ে গেছে তাঁদের কাছে! গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার ততই লাঞ্ছিত করেছেন তাঁরা। ততই তাঁরা বদলে ফেলেছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী।

নয়

সে অর্থে জ্যোতি বসু কোনদিনই কমিউনিস্ট ছিলেন না। এখনও তিনি কমিউনিস্ট নন। কমিউনিস্ট সুলভ জীবনযাপন পালন জ্যোতি বসু কোনদিনই করেননি, এখনও করেন না। তাঁর সমসাময়িক কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে জ্যোতি বসুর জীবনযাপনের কোনও ক্ষেত্রেই কোনও মিল নেই। তাঁর তীক্ষ্ম বাস্তববোধ এবং আকাশছোঁয়া গ্ল্যামারের জোরে জ্যোতি বসু কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা বটে, কিন্তু জ্যোতি বসুর জীবনযাপন যত না কমিউনিস্ট, তার থেকে অনেকখানি পাশ্চাত্য ঘেঁষা উদারনৈতিক গণতন্ত্রীদের কাছাকাছি। জ্যোতি বসুর এই অকমিউনিস্ট সুলভ চেহারাটি জিওফ্রে মুরহাউসের চোখে ধরা পড়েছিলো। মুরহাউস সে কথা লিখেছেনও তাঁর বইয়ে। বাঙালি কমিউনিস্টরা যখন বিলিতি মদ স্পর্শ বা টেনিস খেলাকে বুর্জোয়া জীবনযাপনের অঙ্গ মনে করে অচ্ছুৎ করে দূরে সরিয়ে রেখেছেন—তখন জ্যোতি বসু তা করেননি। তিনি নিভৃত আড্ডায়, পার্টিতে বিলিতি মদ্য পান করেন। তিনি একদা নিয়মিত টেনিসও খেলেছেন। মধ্যবিত্ত ছুঁৎমার্গকে তিনি ধারেকাছে ঘেঁষতে দেননি। এই জীবনযাপনে অভ্যস্ত জ্যোতি বসুকে অবশ্য এমন একটি ইমেজই বজায় রাখতে হয়েছিল বাইরে, যেখানে জনসাধারণ কখনও ভাবতেই পারেন না জ্যোতি বসুর হাতে ধরা পানীয়ের গ্লাস বা টেনিস র‍্যাকেট।

অথচ আগাগোড়া কিন্তু এই জীবনই জ্যোতি বসু যাপন করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির এক অতি পুরনো কর্মীর লেখা থেকে জ্যোতি বসুর এই চিত্র পাওয়া যায়। কমিউনিস্ট পার্টি তখন ভাগ হয়নি। শাসন ক্ষমতার ধারে কাছেও নেই কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তখন গা-গঞ্জে শ্রমিক মহল্লায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন সংগঠন গড়ে তুলতে। মুষ্টিমেয় কিছু শুভাকাঙ্খীর দানে তখন টিমটিম করে চলছে কমিউনিস্ট পার্টির তহবিল। সেই সময়ই জ্যোতি বসুকে পার্টির একটি কর্মসূচিতে নিয়ে যাবার জন্য ওই প্রবীণ কর্মীটি হাজির হয়েছিলেন হিন্দুস্থান পার্কে জ্যোতি বসুর বাড়িতে। কোন জ্যোতি বসুকে দেখেছিলেন তিনি সেদিন? জ্যোতি বসুর বাড়িতে পৌঁছনর পর তাঁকে কিছুক্ষণ বসতে হয়েছিল। একটু পরে জ্যোতি বসু ফিরেছিলেন টেনিস খেলে। এবং ওই কর্মসূচিতে যেতে রাজি হয়ে এটাও জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর জন্য ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর টিকিট চাই। এই জীবনযাত্রার সঙ্গে কোথাও শ্রমিক মহল্লায় বা গ্রামে-গঞ্জে ঘোরা আর পাঁচটা কমিউনিস্ট নেতার জীবনযাপনের মিল রয়েছে?

ক্ষমতায় আসার অনেক আগে কমিউনিস্টরা যখন বিরোধী, তখন কমিউনিস্ট নেতারা

ট্রেনে-বাসে-ট্রামে চড়ে ঘুরে বেড়ালেও জ্যোতি বসুর জন্য বরাদ্দ ছিল গাড়ি। বিরোধী দলনেতা থাকার সময় একটি ফিয়েট গাড়িতে চড়তেন তিনি। এই গাড়িটি তাঁকে পার্টি দেয়নি। গাড়িটি দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী আনন্দী পোদ্দাররা। জ্যোতি বসুর ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু মহলে জেলখাটা বা স্বাধীনতা সংগ্রামী কমিউনিস্টরা কখনও ছিলেন না। বরং ছিলেন বংশকৌলিন্যে নীল রক্তের অধিকারী স্নেহাংশু আচার্য, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এঁরা। যুক্তফ্রন্টের উপমুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় এই জ্যোতি বসুই বিড়লাদের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করতে গিয়েছিলেন। তা নিয়ে হৈ-চৈও হয়েছিল তখন। এই বিড়লা, পোদ্দার, মাহেশ্বরীদের সঙ্গে বরাবরই সুসম্পর্ক জ্যোতি বসুর। এঁরা কখনই কমিউনিস্ট জ্যোতি বসুকে তাঁদের শত্রু হিসেবে মনে করেননি।

জ্যোতি বসু এখনও সেরকমই আছেন। তাঁর সেই জীবনযাপনই এখনও বজায় রেখে চলেছেন তিনি। বরং, আগে অনেক আড়াল আবডাল থাকলেও, এখন আরও অনেক বিষয়েই অনেক বেশি খোলামেলা হয়েছেন জ্যোতি বসু। যুক্তফ্রন্টের উপমুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় বিড়লাদের সঙ্গে জ্যোতি বসু বৈঠক করতে গিয়েছিলেন একান্তে, গোপনে। এখন আর জ্যোতি বসুর তার দরকার হয় না। টাটা-বিড়লা-আম্বানি-গোয়েঙ্কাদের সঙ্গে এখন প্রকাশ্যেই ওঠাবসা করেন তিনি। তাঁদের ভোজসভায় তিনি রীতিমতো আপ্যায়িত হন। শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে পাঁচতারা হোটেলে জ্যোতি বসুর জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। বিদেশ ভ্রমণে গিয়েও শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের আতিথ্য গ্রহণ করেন তিনি সানন্দে। এখনও তাঁর একান্ত বন্ধু মহলে কোনও জেলখাটা আত্মত্যাগী প্রবীণ কমিউনিস্টকে তিনি বরণ করে নেননি। বরং, অনেক শিল্পপতি-ব্যবসায়ী তাঁর একান্ত বন্ধু মহলে ঢুকে গেছেন।

জ্যোতি বসু কোনদিন কমিউনিস্ট ছিলেন না। কোনদিন তিনি কমিউনিস্ট জীবনযাত্রা যাপনও করেননি। কাজেই, গত সতের বছরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই আসে না। জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে যেটুকু ব্যতিক্রম তা হল, আগেকার অনেক আড়াল-আবডাল তিনি এখন সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অন্য সব মার্ক্সবাদী নেতারা? রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় কী রকম পরিবর্তন এসেছে এই গত সতের বছরে?

প্রথমে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। গত সতের বছরে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। এঁদের ভিতর দুজন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এবং একজন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দুই মন্ত্রী হলেন ডঃ অশোক মিত্র এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের মন্ত্রী হলেন যতীন চক্রবর্তী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরে অবশ্য আবার মন্ত্রিসভায় ফিরে গেছেন। কিন্তু অশোক মিত্র বা যতীন চক্রবর্তী আর মন্ত্রিসভায় ফেরত যাননি। এই তিনজনেরই পদত্যাগের পিছনে কারণটা যদি অনুসন্ধান করে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে, কোনও মতাদর্শগত কারণে এঁরা বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ছেড়েছিলেন এমন নয়। দুর্নীতির প্রসঙ্গে সরব হয়েই এঁরা মন্ত্রিসভা ছেড়েছিলেন। শোনা যায়, বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র মন্ত্রিসভা ছেড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তি এবং আত্মীয়পরিজন অন্যায় ও বেআইনিভাবে নানা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে থাকার প্রতিবাদে। এই বিষয়টি নিয়েই অশোক মিত্রের সঙ্গে জ্যোতি বসুর ব্যক্তিগত সংঘাত লেগেছিল। এবং দুজনের

সেই ফাটল ধরা সম্পর্ক এখনও মিল খায়নি। এ প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এক নেতার কাছ থেকে শোনা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পর ডঃ অশোক মিত্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই সময় কিছুদিনের জন্য তিনি একটি নার্সিং হোমে ভর্তি ছিলেন। কিন্তু নার্সিং হোমে ভর্তি থাকা সত্ত্বেও মানসিক অস্থিরতায় ছটফট করছিলেন অশোক মিত্র। ওই সময়ই তাঁর এক ঘনিষ্ঠ মার্ক্সবাদী নেতাকে অশোক মিত্র অনুরোধ করেন, জ্যোতি বসুকে একবার নার্সিং হোমে আসতে বলার জন্য। একান্তে তিনি কয়েকটি বিষয় নিয়ে জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলোচনা করবেন। অশোক মিত্রের অনুরোধ রক্ষা করে জ্যোতি বসু এসেছিলেন নার্সিংহোমে। একান্তে দুজনের ভিতর কথাবার্তাও হয়েছিল। জ্যোতি বসু চলে যাওয়ার পর অশোক মিত্রকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল। ওই মার্ক্সবাদী নেতাটি এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন অশোক মিত্রকে। অশোক মিত্র বলেছিলেন, 'চিফ মিনিস্টারের কিছু কিছু আত্মীয়স্বজনের কয়েকটা ঘটনা জানতাম। সেটাই বলে দিলাম তাঁকে।'

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন ৯৩ সালের মাঝামাঝি। অশোক মিত্র এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দুজনেরই মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের ঘটনা রীতিমতো নাটকীয়। অশোক মিত্র একদিন বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে ঢুকে তাঁর পদত্যাগপত্রটি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে মহাকরণ ছেড়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আর, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দলের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখের ওপর রীতিমতো চেঁচামেচি করে পদত্যাগ পত্র পেশ করে বসেছিলেন। বুদ্ধদেবেরও অভিযোগ ছিল মন্ত্রিসভায় বেশ কিছু সদস্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে। রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠকে বুদ্ধদেব এই বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে 'চোরদের ক্যাবিনেট' বলতেও দ্বিধা করেননি।

যতীন চক্রবর্তীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সংঘাত বেঁধেছিল মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র শুভব্রত ওরফে চন্দন বসুকে কেন্দ্র করে। পূর্তমন্ত্রী থাকার সময় যতীন চক্রবর্তী একটি সরকারি নোটে উল্লেখ করেন যে, চন্দন বসু বেঙ্গল ল্যাম্পের কিছু কর্তাব্যক্তিকে নিয়ে সরকারি অর্ডার পাবার বিষয়ে সুপারিশ করতে এসেছিলেন। এবং শেষ অবধি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই অর্ডার বেঙ্গল ল্যাম্পকে দেওয়া হয়। যতীন চক্রবর্তীর এই নোট সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়ে যেতেই জোর হৈ-চৈ বেঁধে যায় এবং এরই ফলশ্রুতিতে যতীন চক্রবর্তীকে বিদায় নিতে হয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে।

এই তিনটি ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। আর তার থেকেও যেটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তা হল, খোদ মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর আত্মীয় পরিজনদের লক্ষ্য করে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। এ রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর আত্মীয় পরিজনদের লক্ষ্য করে এরকম দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা কিন্তু বামফ্রন্ট আমলেই ঘটল। মার্ক্সবাদী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুই এ রাজ্যের এখন পর্যন্ত একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যাঁকে এবং যাঁর পরিবারকে ঘিরে এইরকম অভিযোগ উঠেছে। এর আগে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জী বা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়—এই ধরনের অভিযোগ আর কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরেই ওঠেনি। ক্ষমতায় আসার আগে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদীরা সরব ছিলেন, যে দুর্নীতি দূরীকরণ তাঁদের অন্যতম ইস্যু ছিল এবং দুর্নীতিমুক্ত পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ার যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন, দেখা গেল, সেই মার্ক্সবাদীদের সরকারকেই

কয়েক বছরের ভিতর এভাবে দুর্নীতি গ্রাস করেছে। এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, মন্ত্রিসভারই একজন সদস্য মন্ত্রিসভাকে 'চোরদের ক্যাবিনেট' বলে উল্লেখ করছেন।

শুধু সরকারে নয়, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরেও বেনোজলের মতো এই দুর্নীতি ঢুকে গেল। এই দুর্নীতি কীরকম গ্রাস করেছিল পার্টিকে, কতখানি অধঃপতন ঘটেছিল পার্টি নেতাদের চরিত্রের তা কলকাতার সাট্টা ডন রশিদ খানের প্রসঙ্গটি তুলে ধরলেই বোঝা যাবে। ৯৩ সালে বউবাজারে রশিদ খানের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের পর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এক সংসদ সদস্যের আত্মীয়া দলের মহিলা সংগঠন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির এক নেত্রীর কাছে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে সংসদ সদস্যের ওই আত্মীয়াটি অভিযোগ করেন, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রথম সারির এক নেত্রীর কাছে তিনি চাকরির সন্ধানে গিয়েছিলেন। নেত্রীটি তাঁকে চাকরি দেবার নাম করে রশিদ খানের কাছে পাঠান। রশিদ খান তাঁকে ভোগ করে। শুধু তাই নয়, তাঁকে ভেট হিসেবে রশিদ খান বিভিন্ন সরকারি আমলা এবং আই পি এস অফিসারের মনোরঞ্জন করতে পাঠায়। এই চিঠিটিকে কেন্দ্র করে পার্টিতে তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। একে একে নানারকম বিস্ফোরক তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকে। জানা যায়, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ওই নেত্রী অনেক অসহায় মহিলাকেই এভাবে রশিদ খানের ডেরায় পাঠিয়েছেন। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ওই নেত্রীর পুত্রের বিবাহ অনুষ্ঠানে রশিদ খানের দোকান থেকে বিরিয়ানি এসেছিল। ওই নেত্রী মোটা টাকাও পেয়েছেন রশিদ খানের কাছ থেকে। শুধু ওই নেত্রীই নয়। পার্টির অনেক জবরদস্ত নেতাও রশিদ খানের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পয়সা নিয়েছেন। রশিদ খানের দেওয়া গাড়ি ব্যবহার করেছেন। রশিদ খানের পয়সায় বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। রশিদ খানের টাকা গেছে পার্টির বিভিন্ন সম্মেলনে জাঁকজমক করতে। রশিদ খানের সাট্টা বাহিনী নির্বাচনের সময় পার্টির হয়ে কাজ করেছে। পার্টির অনেক ওপর মহলের নেতার সঙ্গেই নিত্য ওঠাবসা ছিল এই রশিদ খানের।

রশিদ খানের সঙ্গে পার্টির তাবড় তাবড় নেতাদের এই দহরম মহরমের সম্পর্ক প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব বাধ্য হন পার্টির ভিতর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে। দলের তাবড় তাবড় নেতানেত্রীদের সঙ্গে রশিদ খানের এই সম্পর্ক যে ছিল তা তদন্ত কমিটি স্বীকারও করে নেয়। রশিদ খানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য দুজনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ওই নেত্রী সহ আরও দুজনের বিরুদ্ধে ছ মাসের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সময় পার হয়ে যাবার পর এঁরা আবার পার্টিতে ফিরে এসেছেন।

কলকাতার বুকে এই সাট্টা ডন রশিদ খানের উত্থানও কিন্তু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির হাত ধরেই। রশিদ খানের আগে মধ্য কলকাতায় ডন হিসেবে পরিচিত ছিলেন ওমর। ওমর আবার কংগ্রেস নেতাদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একটি খুনের ঘটনায় ওমরের কারাদণ্ড হলে, তার ফেলে যাওয়া এলাকা দখলের জন্য রশিদ খানকে তুলে আনেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। কিন্তু রশিদ খানের এই ঘটনাই বলে দিচ্ছে, শাসক মার্কসবাদীদের চরিত্রে কতখানি বদল ঘটেছে। আর খোদ ওপরতলাতেই যখন এই অবস্থা হয়েছে, তখন নিচের তলার অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

সতের বছর ক্ষমতায় থাকার পর পার্টিতে যে অবাঞ্ছিত মানুষদের ভিড় বেড়েছে

এবং পার্টির নেতা এবং কর্মীদের চরিত্রও যে অনেকখানি অধঃপতনে গেছে তা অনেক প্রবীণ মার্ক্সবাদী নেতাই স্বীকার করেছেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দেশহিতৈষীর ১৯৯৪ সালের শারদ সংখ্যায় দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য রবীন সেন লিখেছেন, 'অবাঞ্ছিত, ভাগ্যান্বেষী, আত্মপ্রতিষ্ঠাকারী অনেকেই এখন ভিড় জমাচ্ছে পার্টির আশেপাশে।' এই একই শারদ সংখ্যায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক নিরূপম সেনও লিখেছেন, 'পার্টি ক্ষমতায় থাকার কারণে এমন অনেকেই পার্টির কাছাকাছি আসতে চান যাঁদের মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি বা সুবিধা আদায়। এই অংশটি খুব স্বাভাবিকভাবেই মতাদর্শের চর্চায় আগ্রহী নয়। যদি পার্টির অভ্যন্তরে এই চেতনা সঞ্চারিত না হয়, তবে এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, এই সকল সুবিধাভোগী ব্যক্তিরাই পার্টির কর্তৃত্ব দখল করে নেবে। আর এটা যেখানে ঘটবে, সেখানে অতি অবশ্যই মতাদর্শগত ভিত্তি ক্রমেই দুর্বল হতে থাকবে। যদি তাই হতে থাকে তবে পার্টি একসময় কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সুবিধাবাদীদের আখড়ায় পরিণত হবে।'

পার্টির চারধারে যে ক্রমশ অবাঞ্ছিত, ভাগ্যান্বেষী, সুবিধাবাদীদের ভিড় বাড়ছে এবং নেতা-মন্ত্রীদের একটি অংশের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠছে তা নিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে কিছু কম হৈ-চৈ হয়নি। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও চেপে রাখতে পারেননি এই অধঃপতনকে। বছর পাঁচেক আগে দলের রাজ্য কমিটির একটি সভায় নেতা-মন্ত্রীদের এই চারিত্রিক অধঃপতনের বিষয়ে সরব হন দলের প্রবীণ নেতা-নেত্রীদের কেউ কেউ। ওই বৈঠকে এক মন্ত্রীর পুত্র, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্যের পুত্র, এক মন্ত্রী, কয়েকজন এম এল এ এবং বেশ কিছু নেতার নামে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেশ করা হয়। সেই অভিযোগে বলা হয়, বেআইনি জমি বাড়ির ব্যবসায়ে সাহায্য করে এঁরা মোটা টাকা কামাচ্ছেন। রাজ্য কমিটির বৈঠকে এ অভিযোগ ওঠার পরও কিন্তু এই ঘটনা কমেনি। বরং, প্রোমোটার-ডেভেলপর, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নেতা-মন্ত্রীদের আঁতাত আরও বেড়েছে। এ নিয়ে নানা অভিযোগও জমা হয়েছে রাজ্য কমিটির কাছে। ৯৪ সালে পুরসভা নির্বাচনের সময় উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা থেকেও অভিযোগ এসে জমা হয় যে, দলের নেতা-মন্ত্রীদের প্রকাশ্যেই প্রমোটর-ডেভেলপরদের সাথে নিয়ে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। প্রোমোটার-ডেভেলপরদের পার্টির কাজে ঢোকাতে দেখা যাচ্ছে। এতে পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। দলের রাজ্য সম্পাদক শৈলেন দাশগুপ্ত সে সময় দলীয় মুখপত্র গণশক্তিতে বিবৃতি দিয়েও পার্টি নেতা-কর্মীদের এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন।

একেবারে তলার সারির মার্ক্সবাদী নেতাদেরও চারিত্রিক অধঃপতন কোন স্তরে এসে পৌঁছেছে তার একটা উদাহরণ দিই। এই ১৯৯৪ সালেই শ্যামবাজারে এক সাট্টার কারবারিকে গ্রেপ্তার করতে আসে কলকাতা পুলিশের এক বিরাট বাহিনী। কিন্তু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় কয়েকজন নেতার নেতৃত্বে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের এক বিশাল বাহিনী পুলিশকে রুখে দেয়। এমনকি, পুলিশের হেপাজত থেকে গ্রেপ্তার হওয়া আসামী অবধি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এরপর আবার এলাকায় পুলিশের বিরুদ্ধে সভাও করেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা। সেই সভায় বক্তব্য রাখেন দলের কলকাতা জেলা কমিটির প্রথম সারির এক নেতা।

ওপর তলা থেকে নিচের তলা অবধি ব্যক্তিগত জীবনে এই অবক্ষয়ের পাশাপাশিই কিন্তু মার্ক্সবাদীদের চিন্তাচেতনাতেও অবক্ষয়ের আভাস পাওয়া গেল। মার্ক্সবাদীরা বাজারে আমদানি করলেন হোপ কালচার। মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল হোপ'৮৬। বোম্বাই চিত্রতারকারা এসে নাচে-গানে মাতিয়ে রাখলেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতাই সে আসরে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এক ট্রাক মালিককে পদ্মশ্রী খেতাব দেওয়ার সুপারিশ করে বসলেন সুভাষ চক্রবর্তী। এই হোপ'৮৬-র লেজ ধরে বিভিন্ন জায়গায় মার্ক্সবাদী নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বোম্বাই মার্কা নাচগানের আসর বেশ জমিয়ে বসতে লাগল।

গত সতের বছরে শুধু যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদেরই এরকম চারিত্রিক অধঃপতন ঘটেছে তা নয়। বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দল, তাদের অনেক নেতারও এরকম অধঃপতন ঘটেছে। তবে, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তুলনায় তা কম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য শাখার এক প্রথম সারির নেতা, যিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী, লক্ষাধিক টাকার ওপর খরচ করে বছর খানেক আগে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। এমন অভিযোগও উঠেছে যে, বিভিন্ন সরকারি ঠিকাদাররা তাঁর মেয়ের বিয়েতে নানাভাবে সাহায্যও করেছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের এক নেতার বিরুদ্ধে তো বন্দর এলাকায় কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের মদত দেওয়া, নানারকম অসামাজিক কাজকর্ম চালানো এবং অসৎ পথে প্রচুর অর্থ উপার্জনের অভিযোগ রয়েছে। গত সতের বছরে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পরই কিন্তু আস্তে আস্তে এইসব অভিযোগগুলি উঠতে শুরু করেছে। আর এখন তো এরকম হাজার অভিযোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

ব্যক্তিগত জীবনে নীতিনিষ্ঠ থাকার ব্যাপারে এই মার্ক্সবাদীরা একসময় অটল ছিলেন। এমনকি, ৬৭ এবং ৬৯-এ দু-দুবার স্বল্পকালের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার সময়ও কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনযাপন নিয়ে এরকম অভিযোগ ওঠেনি। বরং ৬৭ এবং ৬৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর মহাকরণে মন্ত্রীদের ঘর থেকে ঠান্ডি মেশিনগুলি খুলে নিতে বলেছিল যুক্তফ্রন্ট। এটা কিছুটা ছেলেমানুষী হলেও, অন্তত একটা জেদ তখন মার্ক্সবাদীদের ভিতরে ছিল। ৭২ সালে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এসে কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের লাগোয়া বাথরুমটিকে লক্ষ টাকা খরচ করে সাজিয়েছিলেন। সে নিয়ে মার্ক্সবাদীরা তখন জোর সমালোচনার ঝড় তুলেছিলেন। কিন্তু মার্ক্সবাদী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল সিদ্ধার্থবাবুর বানানো সেই বাথরুমটি মার্ক্সবাদীরা আরও লক্ষ টাকা ব্যয় করে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তুললেন। শুধু বাথরুম কেন, মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষটাও আরও সুন্দর করে, আরও খরচা করে সাজিয়ে তোলা হল। হিন্দুস্থান পার্কের বাসভবন ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে উঠে এলেন রাজভবনের কোয়ার্টারে। সে জন্য রাজভবনের কোয়ার্টার লাখ টাকার বেশি খরচে সাজানো হল। সে কোয়ার্টার থেকে মুখ্যমন্ত্রী চলে গেলেন বিধান নগরের ইন্দিরা আবাসে। বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ইন্দিরা আবাসে বিশেষ ধরনের স্বয়ংক্রিয় দরজা, ফেন্সিং, আলো, ঘরে ঘরে দামি কার্পেট, দামি আসবাবপত্র বসানো হল। হেলিকপ্টারে চড়ে মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় যাওয়া শুরু করলেন। তিনটি বুলেটপ্রুফ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি কেনা হল মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা

ব্যবস্থার জন্যই লক্ষাধিক টাকা খরচ করা শুরু হল। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২-এর সেপ্টেম্বর অবধি সাড়ে চারশো দিন বিদেশ ভ্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৭৭-এ গেলেন ব্রিটেন, যুগোশ্লাভিয়া, ৭৯-তে রোম, বেলগ্রেড, ওয়ারশ, জেনিভা, ৮০-তে লন্ডন, হাঙ্গেরি, ৮২-তে ভুটান, ৮৩-তে মস্কো, বুদাপেস্ট, পারি, লন্ডন, আমস্টারডাম, ৮৪-তে ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, ডেনমার্ক, ৮৫-তে রাশিয়া, ৮৬-তে লন্ডন, পারি, রোম, জেনিভা, এথেন্স, ৮৭-তে বাংলাদেশ, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, ৮৮-তে চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ৮৯-এ ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ৯০-এ ভিয়েতনাম, ভূটান, ব্রিটেন, স্পেন, পশ্চিম জার্মানি, নেপাল; ৯১-এ ব্রিটেন, সুইডেন, জার্মানি, চীন, ৯২-এ ব্রিটেন, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, ইত্যালি। এরপর ৯৩-তেও ইউরোপ ঘুরতে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই সবকটি প্রমোদ ভ্রমণই হয়েছে কিন্তু সরকারি খরচে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় একটা বাথরুম বানিয়ে ভিলেন হয়েছিলেন। কিন্তু মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর জ্যোতি বসু রাতারাতি 'রেড জার' বনে গেলেন।

ক্ষমতায় আসার পর মার্ক্সবাদীদের এই যে পরিবর্তন, এটা কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখেও ঠেকল। ৭৭ সালে বামপন্থীদের ক্ষমতায় আনার সময়ে যে জিনিষগুলি সাধারণ মানুষ বিবেচনা করেছিল, তার ভিতর অন্যতম ছিল বামপন্থীদের জীবনযাপন। ক্ষমতায় আসার আগে বামপন্থীদের অনাড়ম্বর সাধারণ জীবনযাত্রা, সাধারণ মানুষের স্বার্থে তাঁদের কাজ করা—এইগুলিই বামপন্থীদের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। কংগ্রেস শাসন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ সাধারণ মানুষ ভেবেছিল, কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় বসালে, সেই সরকার অন্তত জনসাধাণের স্বার্থে কাজ করবে। এই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়েই কিন্তু ৭৭ সালে বামফন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষই দেখল আস্তে আস্তে কেমন পাল্টে গেল মার্ক্সবাদীদের জীবনযাত্রা। বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের নেতাদের জীবনযাত্রাতেও কেমন পরিবর্তন এলো। সাধারণ মানুষ চোখের সামনে দেখলো বড় মাপের মন্ত্রী নেতা থেকে শুরু করে ছোট মাঝারি মাপের নেতাদের জীবনযাত্রা অবধি আমূল বদলে গেল। বিলাসব্যসনে অভ্যস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন নেতারা। অনেক নেতারই বাড়ি গাড়ি হল। নেতাদের বাড়ির সামনে সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা ভিড় জমাতে শুরু করল। এমনকি, গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত প্রধানরা অবধি রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল। নেতা-মন্ত্রীর আত্মীয়-পরিজনরা নানারকম উপায়ে অর্থোপার্জন করতে শুরু করল। এলাকার সমাজবিরোধী এবং মস্তানরা গিয়ে আশ্রয় নিল পার্টির ছত্রছায়ায়। পার্টির নেতাদের এবং মন্ত্রীদের নামে অভিযোগ উঠতে শুরু করল। সতের বছরে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের শিল্পপতি বনে যাওয়া নিয়ে নানারকম কাহিনী শোনা যেতে লাগল। মার্ক্সবাদীদের এই জীবনযাত্রা সতের বছর পরে তাঁদের সম্পর্কে আশাহতই করল সাধারণ মানুষকে।

খুব সহজ, সরল, অনাড়ম্বর যে আর নেই মার্ক্সবাদীদের জীবনযাত্রা তা আরও একটা ঘটনায় ভালো করে বোঝা যাবে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব বারবার তাঁদের নেতা-মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আয়ব্যয় ও সম্পত্তির হিসাব দাখিল করতে বললেন পার্টিকে। কিন্তু কয়েকজন বাদে অধিকাংশ নেতা-মন্ত্রীই তা

করলেন না। কয়েকজন তো আবার ভুল তথ্য দাখিল করলেন পার্টিকে। পার্টির বারবার আবেদনেও কাজই হল না।

ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে পার্টির নেতা এবং কর্মীদের এই চারিত্রিক অধঃপতনে বরিষ্ঠ নেতারাও আশঙ্কিত এবং আতঙ্কিত হয়েছেন। এ হারে পার্টির নেতা এবং কর্মীদের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটতে থাকলে পার্টির ভবিষ্যৎ কী হবে তা ভেবেই আতঙ্কিত এবং আশঙ্কিত হয়েছেন পার্টির নেতারা। বরিষ্ঠ এই নেতাদের কথাবার্তায় এই আশঙ্কা ফুটেও উঠছে। ৯৪-এর অক্টোবর মাসে দলের কলকাতা জেলা কমিটির এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে কলকাতা জেলা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক লক্ষ্মী সেন বলেছেন, 'পার্টির সদস্য সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু পার্টি শক্তিশালী হয়নি।' শক্তিশালী না হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি পার্টি সদস্যদের রাজনৈতিক চেতনার মান বৃদ্ধি না ঘটাকেই নির্দেশ করেছেন। লক্ষ্মী সেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্যও। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর আর এক প্রবীণ সদস্য এবং দলের শ্রমিক সংগঠন সিটুর রাজ্য সভাপতি নীরেন ঘোষও আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। ৯৪-এর অক্টোবরেই দলের দৈনিক মুখপত্র গণশক্তিতে নীরেন ঘোষ লিখেছেন, 'একথাও মনে রাখা দরকার সমাজবিরোধীরা, সুবিধাবাদীরা শাসক পার্টির ছত্রছায়ায় থাকতে চায় বা আশেপাশে ভিড় করে। যদি পার্টি রাজ্যের ক্ষমতায় না থাকে তবে আজকাল যাদের দেখা যায় পার্টির আশেপাশে ভিড় করে আছে, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা হাওয়া হয়ে উড়ে যাবে। টিকিও দেখা যাবে না। আগে যে পার্টির ভাবমূর্তি ছিল তা আজ আছে কী? কতটুকু ম্লান হয়েছে? সামনে যদি আশার আলো না থাকে তো আদর্শভ্রষ্টতাও দেখা দিতে পারে। আর অশ্রমিক নীতিহীন কাজকর্ম যদি একটু একটু করে দেখা দেয়, তবে পার্টির বিপ্লবী সত্ত্বা ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হবেই।'

সতের বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে এটাই দেখা যাবে, ধীরে ধীরে মার্ক্সবাদীদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় এরকমই পরিবর্তন এসেছে। আর এই পরিবর্তনের পাশাপাশিই তাঁদের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও ঘটেছে বদল। অর্থাৎ মার্ক্সবাদীদের বদলটা ঘটেছে ভিতরে বাইরে সর্বত্রই। ঘটেছে সার্বিক বদল।

দশ

শ্রমিক এবং কৃষকের সরকার হিসাবেই ১৯৭৭ সালে মার্ক্সবাদীদের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার আগে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারগুলির বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদীদের বড়ো অভিযোগই ছিল যে, ওই সরকারগুলি শ্রমিক-কৃষক-খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার নয়। ধনিক-বণিক-পুঁজিপতি এবং ভূস্বামীদের সরকারই কংগ্রেস সরকার। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সরকার তাই বরাবরই পুঁজিপতিদের সরকারের আখ্যাই পেয়ে এসেছে মার্ক্সবাদীদের কাছ থেকে। ৭৭ সালে নির্বাচনের আগে নির্বাচনী ইস্তাহারেও তাই মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় এসে শ্রমিক-কৃষক এবং খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার কথাই জোর দিয়ে বলেছিল। ৭৭ এবং ৮২-র পরপর দুটো সাধারণ নির্বাচনের সময়ই নির্বাচনী ইস্তাহারে বামফ্রন্ট এবং মার্ক্সবাদীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, 'শ্রমজীবী

এবং মেহনতী জনগণের সমস্ত ধরনের ন্যায়সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করা; শিল্প বিরোধগুলির দ্রুত মীমাংসা ও শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্প সম্পর্ক আইনগুলির আরও সংশোধন করা।'

কিন্তু পুঁজিপতিদের কংগ্রেস সরকার নয়, ৭৭ সালে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের এই মার্ক্সবাদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর মেহনতি মানুষের আন্দোলনের প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে? কী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে তা মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে, কিছু কিছু তুলে ধরেছি। মার্ক্সবাদীদের অনাড়ম্বর, সহজ, সরল জীবনযাত্রার বদলের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও যে বদলে গেল, তা বোঝাতে আগে বলা একটি ঘটনারই আবার উল্লেখ করি। ১৯৮৮ সালের ২৮ মার্চ নদীয়ার বাগদিয়ায় কৃষকদের বিক্ষোভের ওপর গুলি চালিয়েছিল মার্ক্সবাদী সরকারের পুলিশ। এতে দুজন কৃষক নিহতও হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষকদের কী অপরাধ ছিল সেদিন? বাগদিয়ার ওই কৃষকরা তাঁদের চাষের জমিতে উপযুক্ত সেচের অভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পাচ্ছিলেন না দীর্ঘদিন ধরে। ফলে তাঁদের চাষের কাজ নষ্ট হয়ে পেটের ভাতেই টান পড়ছিল। সেচের জন্য বারবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েও ব্যর্থ হচ্ছিলেন কৃষকরা। এরপরই ক্ষুব্ধ কৃষকরা ৮৮ সালের ২৮ মার্চ বাগদিয়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করল। সেই বিক্ষোভ হঠাতে এসেই পুলিশ গুলি চালিয়ে দুজন কৃষককে হত্যা করে। মার্ক্সবাদীদের সরকার ক্ষমতায় আসার ঠিক এগারো বছরের মাথাতেই চাষের জলের দাবিতে বিক্ষোভরত কৃষকদের প্রতি এই আচরণ করেছিল মার্ক্সবাদীদের সরকার।

শ্রমিক-কৃষক-খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের স্বার্থরক্ষার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে মার্ক্সবাদীদের সরকার ক্ষমতায় এসে কৃষকদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিল, তেমনই শ্রমিকদের প্রতিও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী যে এই সতের বছরে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ রয়েছে এমনও নয়। মার্ক্সবাদীদের শাসনকালেই এ রাজ্যে শ্রমিকদের অবস্থা যেমন হয়েছে, তার কিছু খন্ডচিত্র তুলে ধরছি। গত কয়েকবছরে এ রাজ্যে বিভিন্ন কয়েকটি কলকারখানা বন্ধ হয়ে পড়ার ফলে কতজন শ্রমিক ক্ষিধের জ্বালায় মারা গেছেন তার একটা হিসাব তুলে ধরছি :

	সংস্থার নাম	বন্ধ হয়েছিল	মারা গেছেন
১।	ইণ্ডিয়া রাবার ম্যানুফ্যাকচারিং	১৯৮৪	৩০
২।	ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ	১৯৮৩	২৯
৩।	বেনি ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৮৭	৭৫
৪।	বঙ্গোদয় কটন মিল্স	১৯৮৪	১৩০
৫।	বাসন্তী কটন মিল্স	১৯৮৭	১৪
৬।	ভিগল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৮৫	৯
৭।	অ্যালুমিনিয়ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি	১৯৮৪	৩১
৮।	ডানবার কটন মিল্স	১৯৮৭	১৫০
৯।	টিটাগড় পেপার মিল্স	১৯৮৬	১৪
১০।	মেটাল বক্স	১৯৮৭	৩৮
১১।	কোলে বিস্কুট	১৯৮০	৩৫

১২।	বেঙ্গল পেপার মিল	১৯৮৩	১৫০
১৩।	শ্রীদুর্গা কটন অ্যাণ্ড উইভিং মিল্‌স	১৯৮৬	৬৬
১৪।	অরবিন্দ বেনালি লিমিটেড	১৯৮৬	৩
১৫।	হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস	১৯৮৩	১৫১
১৬।	নেপচুন পেপার মিল্‌স	১৯৮৭	১৫
১৭।	বি এন. টি মিল্‌স	১৯৮৫	২৯
		মোটঃ	৯৮২ জন শ্রমিক

ভাবা যায়! শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে মার্ক্সবাদীদের সরকার, তাদের শাসনকালেই কোম্পানি লক আউট হওয়ায় ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ৯৮২ জন শ্রমিক মারা গেছেন! তাও তো, গত কয়েকবছরে এই ৯৮২ জনের হিসেব পাওয়া গেছে। আরও কতো এমন শ্রমিক খিদের জ্বালায় মারা গেছেন যাঁদের কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি। এঁরা ছাড়াও, আর একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, মার্ক্সবাদী সরকারের আমলেই ২৮টি বন্ধ কলকারখানার মোট ৪১ জন শ্রমিক খিদের জ্বালায় আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। এক্ষেত্রেও কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই হিসেবের বাইরেও প্রচুর আত্মহননকারী শ্রমিক থেকে যেতেই পারেন।

কিন্তু খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এই মার্ক্সবাদী সরকারের আমলেই যেসব শ্রমিকরা এভাবে মারা গেছেন বা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন, তাঁদের প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে মার্ক্সবাদী সরকার? কী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে সেকথা বোঝাতে গেলে হাওড়ার পরেশ মালের ঘটনাটির কথা উল্লেখ করতে হবে। হাওড়ার গেস্ট কিন উইলিয়মস কারখানায় কাজ করতেন পরেশ মাল। গেস্ট কিন উইলিয়মসে লক আউট হয়ে যাবার পর তিনি বেকার হয়ে পড়েন। বাড়িতে তাঁর তিন কন্যা এবং এক পুত্র ছিল। কারখানা লক আউট হয়ে যাবার পর বেকার পরেশ মালের পক্ষে সংসার চালানোই অসম্ভব হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে থাকতেন তাঁর বাড়ির লোকেরা। শেষে একদিন ক্ষিধের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পরেশ মালের তিন কন্যা আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনা চেপে রাখার জন্য মার্ক্সবাদী নেতারা রাতারাতি রটিয়ে দিলেন পরেশ মালের মানসিক বিকৃতি ঘটেছে। এই ঘটনা নিয়ে পরেশ মাল যাতে কারও সঙ্গে কথা বলতে না পারেন, তার জন্য তাঁকে জোর করে সরকারি হেপাজতে মানসিক চিকিৎসালয়েও পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই ঘটনায় দুঃখ এবং নিন্দা প্রকাশ করে অন্যান্য যে সংগঠনগুলি বক্তব্য রেখেছিল, মার্ক্সবাদী নেতারা তাঁদেরও সমালোচনা করলেন।

হাওড়ার পরেশ মাল বা তাঁর পরিবারের লোকজনেরা আন্দোলন, বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের রাস্তা খুঁজে পাননি। তাঁদের আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। কিন্তু, মার্ক্সবাদীদের নেতৃত্বাধীন এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই শ্রমিকরা এ রাজ্যে অন্যায় শোষণ এবং অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে। সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের সেইসব আন্দোলনের প্রতি মার্ক্সবাদীদের সরকার কী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে? আগে সে ঘটনাগুলির কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। আবার তা এখানে একটু উল্লেখ করা হল। শ্রমিকদের সেই

আন্দোলনের প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে মার্ক্সবাদীদের সরকার, তা শ্যামনগরের গৌরীশঙ্কর জুট মিল, তেলিনিপাড়ার ভিক্টোরিয়া জুট মিল এবং ফুলেশ্বরের কানোরিয়া জুট মিলের ঘটনাগুলি থেকেই পরিষ্কার। শ্যামনগরের গৌরীশঙ্কর জুট মিলে শ্রমিকদের দীর্ঘদিন ধরেই বেতন ও অন্যান্য পাওনা-গণ্ডা নিয়মিত হচ্ছিল না। বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রমিকরা তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করে অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। ৯০ সালে পুজোর আগে সেপ্টেম্বর মাসে নিজেদের প্রাপ্য বেতন ও অন্যান্য পাওনা-গণ্ডা না পেয়ে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ক্ষোভ যখন তাঁদের চরমে পৌঁছয়, সেই সময়ই একদিন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মিলের ভিতর অফিসারের ঘরে ভাঙচুর চালায়। মিল ম্যানেজার পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে গুলি চালালে তাতে রাজেশ্বর রাই নামে একজন শ্রমিক মারা যান। শ্রমিকরা যে তাদের প্রাপ্য বেতন দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছিলেন না, তাদের পাওনা-গণ্ডা যে মেরে দেওয়া হচ্ছিল, মার্ক্সবাদীরা সে কথা একবারও বললেন না। বরং, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ-র প্রবীণ নেতা নীরেন ঘোষ শ্রমিকদের ওপর পুলিশের এই গুলি চালনাকে সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, 'পুলিশের গুলিচালনা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।'

ভিক্টোরিয়া জুট মিলের শ্রমিকদের প্রতি মার্ক্সবাদী সরকারের পুলিশ যে আচরণ করেছে তা এককথায় মধ্যযুগীয়। হুগলির তেলেনিপাড়ায় অবস্থিত এই চটকলটির মালিকানা রয়েছে ব্রিটিশ নাগরিক ব্রিয়ালির হাতে। এই ব্রিয়ালি সাহেব আবার মার্ক্সবাদী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, সরকারের প্রথম সারির অনেক আমলা এবং রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। ব্রিয়ালির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর যে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, তার প্রমাণও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর লেখায়। ৯২ সালে দেশহিতৈষীর শারদ সংখ্যায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই লিখেছিলেন, বিদেশে গিয়ে তিনি যখন বিভিন্ন শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তাঁদের ভিতর ব্রিয়ালি সাহেবও থাকেন। ব্রিয়ালি সাহেব সম্বন্ধে নানারকম অভিযোগও অবশ্য রয়েছে। ব্রিয়ালি সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে খোদ লন্ডনের স্টক এক্সচেঞ্জে। এ দেশেও তাঁর কিছু অর্থনৈতিক অপরাধের বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্ত চালায়। অভিযোগ যে, সেই সময় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি সি বি আই-র অফিসারদের টেলিফোন করে শাসান। এমনকি, ব্রিয়ালির বিরুদ্ধে আদালতে সি বি আই যে মামলা করে, সেই মামলায় ব্রিয়ালির হয়ে সওয়াল করতে নামেন মার্ক্সবাদী নেতা এবং রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্ত স্বয়ং।

ব্রিয়ালি এখানে চারটি চটকলের মালিকানা কিনে নিয়েছিলেন। তার ভিতর অন্যতম তেলিনিপাড়ার এই ভিক্টোরিয়া জুট মিলটি। এই জুট মিলটি ব্রিয়ালি সাহেব লক আউট ঘোষণা করে দেন। শ্রমিকদের তাঁদের দীর্ঘদিনের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা থেকেও বঞ্চিত করা হয়। শ্রমিকদের এই অসহায় অবস্থায় সব থেকে আশ্চর্যজনক ভূমিকা পালন করে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠনগুলি। কংগ্রেস প্রভাবিত আই এন টি ইউ সি এবং মার্ক্সবাদীদের শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ—দুপক্ষই আশ্চর্য রকম নীরবতা অবলম্বন করে। দুপক্ষই শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা আদায়ের কোনও আন্দোলনেই যেতে চায় না। শ্রমিকরা অভিযোগ তোলেন, মিল মালিকদের সঙ্গে তলায় তলায় আঁতাত করে শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতারা আন্দোলন করছেন না। ৯৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই জুট মিলের শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে মিল অফিস এবং শ্রমিক সংগঠনের

নেতাদের বাড়িতে হামলা চালায়। প্রথমে মিল চত্বরে তারা ব্যাপক ভাঙচুর করে। তারপর চড়াও হয় প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতাদের বাড়িতে। নেতাদের মারধার করা হয়। প্রাণের ভয়ে নেতারা পালান। পুলিশ ডেকে আনেন মিলের মালিকপক্ষ। পুলিশ ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ওপর গুলিও চালায়। গুলিতে কয়েকজন শ্রমিক আহত হন। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এরপর এক পুলিশ কর্মীকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

এই ঘটনা যেদিন ঘটে তার পরদিন রাতেই তেলিনিপাড়ায় শ্রমিকদের বস্তিতে হামলা চালায় বিরাট পুলিশ বাহিনী। ভিখারি পাশোয়ান নামে এক শ্রমিককে তাঁর বাড়িতে পরিবার পরিজনের চোখের সামনে থেকেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরদিন থেকে ভিখারি পাশোয়ানের আর কোনও খোঁজই মেলে না। ভিখারি পাশোয়ানকে যে ধরা হয়েছিল সেই তথ্যই পুলিশ অস্বীকার করতে চেষ্টা করে। আজ অবধি এই ভিখারি পাশোয়ানের কোনও সন্ধানই মেলেনি। বিভিন্ন মহল থেকে ওঠা এই অভিযোগকে ঘিরে এখন এই সন্দেহই দানা বেঁধেছে যে, ভিখারি পাশোয়ানকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করে পুলিশ তাঁর লাশ গায়েব করে দিয়েছে। ভিখারি পাশোয়ানের নিখোঁজ হওয়ার এই ঘটনাটিকে নিয়ে আন্দোলনে নামে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনিপাড়ায় অবস্থান বিক্ষোভ করেন। কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করা হয় প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কলকাতা হাইকোর্টে পৃথক আর একটি মামলা দায়ের করে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি। ভিখারি পাশোয়ানের বিষয়টিকে নিয়ে যখন জল ঘোলা হয়ে উঠেছে, তখন পুলিশ গোটা ঘটনাটিকে অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য এক মহিলাকে ভিখারি পাশোয়ানের দ্বিতীয় স্ত্রী সাজিয়ে আসরে নিয়ে আসে। এছাড়াও, একটি মহল থেকে ভিখারি পাশোয়ানের চরিত্র নিয়ে নানারকম গল্পও ফাঁদা হয়। কিন্তু পুলিশের এই চাল অচিরেই ধরা পড়ে যায়। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির মামলাটি খারিজ হয়ে গেলেও, প্রদেশ যুব কংগ্রেসের দায়ের করা মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। গোটা ঘটনাটির তদন্তভার সি বি আই-র হাতে অর্পণ করেন সুপ্রিম কোর্ট। সি বি আই-র হাতে এই ঘটনাটির তদন্তভার চলে যাবার পরই, এই ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত এক আই পি এস অফিসার এইচ পি সিং-কে ছ মাসের জন্য মোজাম্বিকে পাঠিয়ে দেয় রাজ্য সরকার। মোজাম্বিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখাতেই নাকি তাঁকে পাঠানো হয়েছে। ভিক্টোরিয়া জুট মিলের এমন অবস্থা ঘটে যাবার পরও কিন্তু মার্ক্সবাদীরা একবারও সেখানকার শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াননি। বরং, বিভিন্নভাবে ভিক্টোরিয়া জুট মিলের শ্রমিকদের বিরুদ্ধেই বক্তব্য রেখে গিয়েছেন তাঁরা।

কানোরিয়া জুট মিলের ঘটনাটিও প্রায় একই রকম। এই জুট মিলের মালিক শিবশঙ্কর পাসারিও মার্ক্সবাদী সরকার এবং মার্ক্সবাদী নেতাদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এই জুট মিলেও দীর্ঘদিন শ্রমিকদের তাঁদের নায্য পাওনা-গন্ডা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। শ্রমিকদের পাওনা-গন্ডা থেকে বঞ্চিত করে রেখেই পাসারি ৯৩ সালের নভেম্বর মাসে মিলটিতে লক আউট ঘোষণা করেন। সি আই টি ইউ এবং আই এন টি ইউ সি-র মতো প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছেড়ে এসে শ্রমিকরা তাঁদের নতুন সংগঠন সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে। সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন মিলের দখলও নিয়ে নেয়। নিজেরাই উৎপাদন চালু রাখার কথা ঘোষণা করে। আর তখনই সি আই

টি ইউ এবং আই এন টি ইউ সি-র নেতারা এই শ্রমিকদের বিরোধিতা করতে আসরে নেমে পড়ে। এরা সভা করে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের নামে কুৎসা ছড়াতে থাকে। আই এন টি ইউ সি-র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সি আই টি ইউ-র নীরেন ঘোষের মতো প্রতিষ্ঠিত নেতারা কলকাতা থেকে ফুলেশ্বরে গিয়ে একই মঞ্চে সভা করে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নকে নানারকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করে আসেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় ক্যাডাররা আশ পাশের গ্রামে শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের হুমকিও দেয়। মিল শ্রমিক মুক্ত করার জন্য পাসারি এরপর পুলিশের সাহায্যও চান। পাসারিকে সাহায্য করতে প্রশাসন ব্যাপকভাবে ঝাঁপিয়েও পড়ে। হাওড়ার জেলা শাসক এবং জেলার পুলিশ সুপার বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে শ্রমিক মহল্লায় এবং মিলের ভিতর মারধর করে শ্রমিকদের বের করে দেন। মিল খোলা এবং চালানোর দাবিতে এরপর সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের বৃহত্তর আন্দোলনকে রুখতে ফের বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ বাহিনী। রাতের অন্ধকারে শ্রমিক মহল্লায় ব্যাপক হামলা চালানো হয়। সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে মঞ্চ বানানো হয়েছিল তা ভেঙে দেওয়া হয়। ইউনিয়নের অনশনরত নেতা প্রফুল্ল চক্রবর্তী সহ আরও দুজনকে জোর করে তুলে এনে কলকাতার পি জি হাসপাতালে আটকে রাখা হয়। জোর করে খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয় তাঁদের। পুলিশ দিয়ে গোটা হাসপাতাল ঘিরে রাখা হয়। প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভানেত্রী এবং সংসদ সদস্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁকেও বাঁধা দেওয়া হয়। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে আসেন। এরপরে অবশ্য দিল্লীতে এবং কলকাতায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের উপস্থিতিতে কানোরিয়া জুট মিল নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে। ৯৪-র সেপ্টেম্বরে কানোরিয়া জুট মিলের লক আউটও উঠেছে। কিন্তু মিল মালিক পাসারি শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা-গন্ডা নিয়ে নানারকম টালবাহানা এখনও করছেন এবং আইনের নানারকম কথা বলে মিলটিকে ফের বন্ধ করে দেবার হুমকিও দিচ্ছেন। আর প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং তাদের নেতারা কানোরিয়ার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এখনও তাদের কুৎসা অব্যাহত রেখে গেছেন।

ভিক্টোরিয়া এবং কানোরিয়া জুট মিলের ঘটনা দুটি থেকে কয়েকটি জিনিষ বেশ পরিষ্কার। মুখে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের সরকার বললেও, গত সতের বছরে শ্রমিক-কৃষক-খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনের পাশে মার্ক্সবাদীরা আদৌ দাঁড়াননি। দাঁড়াননি বলেই, সতের বছর ক্ষমতায় থাকার পর কংগ্রেসের তথাকথিত শ্রমিক নেতাদের পাশাপাশি মার্ক্সবাদী শ্রমিক নেতাদের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন শ্রমিকরা। শ্রমিকরা এই শ্রমিক নেতা এবং সংগঠনগুলির আঁওতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের মতো করে সংগঠন গড়ে তুলতে চাইছেন। এমনকি, কংগ্রেস-মার্ক্সবাদী নির্বিশেষে এই শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদেরই রোষের কবলে পড়ছেন। এতে এটাও প্রমাণ হচ্ছে যে, মার্ক্সবাদীরা শাসন ক্ষমতায় থাকাকালীন শ্রমিক আন্দোলনকে যথাযথ মর্যাদা এবং নেতৃত্ব দিতে পারেননি বলেই এভাবে তাঁদের নেতৃত্বের প্রতি শ্রমিকরা আস্থা হারাচ্ছেন। আরও একটি জিনিস এসব ঘটনাগুলিতে লক্ষ্য করার মতো। তা হল, এই প্রত্যেকটি ঘটনায় শ্রমিকদের ওপর

প্রশাসনের হামলা এবং শাসক মার্ক্সবাদীদের কুৎসা নেমে এলেও, দোষী মালিকদের প্রতি কিন্তু কোনরকম ব্যবস্থাই শাসক-মার্ক্সবাদীরা নেননি। যদিও ৭৭ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে তাঁদের বক্তব্য ছিল, শ্রমিক-কৃষকদের নায্য অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার সর্বদাই সচেষ্ট থাকবে। প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠন এবং তাদের নেতাদের প্রতি পুরোপুরি আস্থাহীনতা ও অশ্রদ্ধা থেকে শুধু কানোরিয়া বা ভিক্টোরিয়া জুট মিলই নয়। আরও অনেক কারখানার শ্রমিকরাই এই প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির আওতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তুলেছেন। যেমন রেমিংটন র‍্যাণ্ডের কলকাতা অফিস, অ্যাঙ্গাস জুট মিল, কেলভিন জুট মিল, নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জুট মিল, হনুমান জুট মিল, বরানগর জুট মিল, প্রেমচাঁদ জুট মিল, আগরপাড়া জুট মিল প্রভৃতি।

প্রশাসনের এই রকম নগ্ন আক্রমণ এবং মার্ক্সবাদী শাসকদের ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের পাশাপাশি আরও নানাভাবে এই মার্ক্সবাদী সরকারের আমলেই বঞ্চিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা। যেমন, তাঁদের নায্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মেরে দিয়েছেন মালিকপক্ষ। সেই টাকা গায়েব করে মালিকপক্ষও গায়েব হয়ে গেছেন। আবার এই শ্রমিক-কর্মচারিদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের নায্য টাকা জমা না দেবার তালিকায় মার্ক্সবাদী পরিচালিত এই সরকারের বিভিন্ন সংস্থাও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক কর্মচারীদের এই নায্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা যে এভাবে মেরে দেওয়া হচ্ছে, এবং সে টাকার অঙ্ক যে বিশাল তা সি পি আই-র সংসদ সদস্য গুরুদাস দাশগুপ্তর নেতৃত্বাধীন প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত কমিটি স্বীকার করেছেন। একথা তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে জানিয়েছেন।

একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৯২ সাল পর্যন্ত এই পশ্চিমবঙ্গেই বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের পরিমাণ ছিল মোট ১৪৩.০৮ কোটি টাকা। ৯৩ সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৮.০৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে, এই ৯৩ সালেই সারা দেশে মোট বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের পরিমাণ ২২৩ কোটি টাকা। ভাবা যায়, সারা দেশের ২২৩ কোটির ভিতর একমাত্র মার্ক্সবাদী সরকারের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গেই বকেয়ার পরিমাণ ১৫৮.০৯ কোটি টাকা। আর এরই পাশাপাশি কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্রে এই একই সময়ে বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের পরিমাণ মাত্র ২৪ কোটি টাকা।

আর, শ্রমিক-কর্মচারীর এই বিপুল পরিমাণ নায্য টাকা উদ্ধারে মার্ক্সবাদী সরকার কতটা উদ্যোগী হয়েছে? আর একটি হিসাব তুলে দিচ্ছি। ১.৭.৯৩ তারিখ পর্যন্ত নায্য প্রভিডেন্ট ফান্ড বাকি রাখার ব্যাপারে ৩,২৪৯ টি সংস্থা অভিযুক্ত ছিল। ৩০.৯.৯৩ তারিখ পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড বাকি রাখার ব্যাপারে পুলিশ এদের ভিতর মাত্র ১৩ জনের বিরুদ্ধে এফ আই আর করেছে! পুলিশ প্রশাসনের এই ভূমিকার পাশাপাশি আদালতের দীর্ঘসূত্রতাও রয়েছে। এ রাজ্যের আদালতে কোন সংস্থায় কবে থেকে কিভাবে বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত মামলা ঝুলে আছে, তারও একটা হিসাব তুলে দিচ্ছি:

সংস্থার নাম	কবে থেকে মামলা
অ্যাঙ্গাস জুট মিল	১৯৮৪
কেলভিন জুট মিল	১৯৯০
টিটাগড় জুট মিল	১৯৮৪

মহাদেও জুট মিল	১৯৮৪
ভিক্টোরিয়া জুট মিল	১৯৮৪
অম্বিকা জুট মিল	১৯৮৪
নিজাম রেস্তোরাঁ	১৯৮৩
মালডাং টি এস্টেট	১৯৮৫
গৌরীপুর জুট মিল	১৯৮৯
সুরেন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৮৩
এথেলবাড়ি টি এস্টেট	১৯৮৩
কমলা টি কোম্পানি	১৯৮২
ফ্লুরিজ কনফেকশনার্স	১৯৮২
অ্যালায়েড কেরিয়ার	১৯৭৮
রংপুর টি অ্যাসোসিয়েশন	১৯৭৬
হিলপুকুরিয়া টি এস্টেট	১৯৮৪
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ	১৯৮৬
চৌধুরি ইন্ডাসিট্রয়াল কর্পোরেশন	১৯৮২
সোদপুর কটন মিল	১৯৮২
খেতোয়ারি প্ল্যান্টেশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	১৯৭৮
পোদ্দার প্রজেক্টস	১৯৮৯
হুগলি মিলস	১৯৯২
এম্পায়ার জুট মিল	১৯৮৮
ভিরদি ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৯০

পশ্চিমবঙ্গের যেসব সংস্থায় এভাবে বিপুল পরিমাণ টাকা বাকি রয়ে গিয়েছে, তাদের ভিতর চটকলগুলিই শীর্ষে। পশ্চিমবঙ্গের মোট ৩৯ টি চটকলের মোট্-বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের পরিমাণ হচ্ছে ৮৫ কোটি ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা! শুধু যে চটকল বা বেসরকারি সংস্থাগুলো এ রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা এভাবে জমা দেয়নি তা নয়। খোদ রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত বিভিন্ন সংস্থা শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা বকেয়া রেখেছে। যেসব রাজ্য সরকারি অধিগৃহীত সংস্থা শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা বকেয়া রেখেছে, তাদের নাম এবং বকেয়া টাকার পরিমাণ এইরকম—ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ৯.৭৯ লক্ষ টাকা, ইন্ডিয়ান হেলথ ইন্সটিটিউট ৫.০৬ লক্ষ টাকা, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ২,৪৯৬.৪৫ লক্ষ টাকা, দক্ষিণ বঙ্গ পরিবহন ৪৪.১৯ লক্ষ টাকা, কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন ৬৪৮.০৪ লক্ষ টাকা, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন ৮৩৭.৭০ লক্ষ টাকা, ওয়েস্টিং হাউস স্যাকসবি ফারমার ২৮৬.৪৯ লক্ষ টাকা। অবশ্য এর ভিতর কিছু কিছু টাকা জমা পড়ছে বলে শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু চটকল এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির কিছু অসাধু মালিক এভাবে যে দিনের পর দিন শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাপ্য টাকা মেরে দিয়ে যাচ্ছেন—তা প্রতিরোধ করতে মার্ক্সবাদী শাসকরা কী ব্যবস্থা নিলেন? প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বকেয়া রাখার অভিযোগে মাঝখানে খুব হৈ-চৈ করে গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করল রাজ্য সরকার। কিন্তু দেখা গেল,

এই অসাধু মালিকদের সঙ্গেও মার্ক্সবাদী-শাসকদের গাঁটছড়া বাঁধা। তাই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ওই মালিকদের বেরিয়ে আসতে কোনও অসুবিধা হল না। শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাকি রাখার জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন চটকল মালিক অরুণ বাজোরিয়া। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাকি রাখা অজামিনযোগ্য অপরাধ। কিন্তু অরুণ বাজোরিয়া গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলে খবর পৌঁছে গেল। আদালতের নির্দেশ একদম অমান্য করেই পুলিশ তাঁকে জেল হাজতের বদলে পৌঁছে দিল কলকাতার বিখ্যাত ব্যয়বহুল একটি নার্সিং হোমে। সেখানেই বিশ্রাম নিতে থাকলেন অরুণ বাজোরিয়া। আবার এই অসাধু মালিকদের গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গেই শোরগোল উঠল, এ রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। বিনিয়োগকারীরা ক্ষেপে যাবেন এতে। অমনি মার্ক্সবাদীদের সরকারও হাত-পা গুটিয়ে নিল। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান ধামা চাপা পড়ে গেল।

শুধু প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নয়। মার্ক্সবাদী শাসিত এই পশ্চিমবঙ্গেই ই এস আই (এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স)-এর দেয় টাকাটাও মালিকরা দিচ্ছেন না। এভাবেও শ্রমিক-কর্মচারীরা বছরের পর বছর বঞ্চিত হচ্ছেন। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে ৮৯-৯০ সালে ই এস আই-তে বকেয়ার মোট পরিমাণ ছিল ৩৯.৮৫ কোটি টাকা। এই সময়ে আদায় হয়েছে মাত্র ১.৩৩ কোটি টাকা। ৯০-৯১-তে বকেয়ার মোট পরিমাণ ছিল ৪৩.৭৮ কোটি টাকা। আদায় হয়েছে মাত্র ১.২১ কোটি টাকা। ৯১-৯২-তে বকেয়ার মোট পরিমাণ ছিল ৪৮.২৩ কোটি টাকা। আদায় হয়েছে মাত্র ১.৮১ কোটি টাকা। ৯২-৯৩-তে বকেয়ার মোট পরিমাণ ছিল ৫২.৯৩ কোটি টাকা। আদায় হয়েছে মাত্র ৩.৬৬ কোটি টাকা। এই বিষয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অভিযোগও করা হয়েছিল যে, এভাবে ই এস আই-র টাকা জমা না দেবার ব্যাপারে অভিযুক্ত মালিকদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে অভিযোগের অনুসন্ধান করছে না।

নানারকম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিলেও, সত্যি শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থ মার্ক্সবাদীরা কতখানি দেখেছেন শাসনক্ষমতায় এসে, তার একটি ছোট উদাহরণ দিই। রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন একমাত্র চটকল হচ্ছে ভারত জুট প্রসেস। ভারত জুট প্রসেস অবশ্য এখন নামে মাত্র সরকারি উদ্যোগ। রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে কনভারশন প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই মিলটি এখন চালাচ্ছেন ব্যক্তি মালিক বি সি জৈন। এই মিলটিতে কুখ্যাত কাটাউতি প্রথা বর্তমান। এই 'কাটাউতি' প্রথা অনুযায়ী শ্রমিকদের মাইনে বাধ্যতামূলকভাবে কম দেওয়া হচ্ছে। সব জেনেশুনেও কিন্তু মার্ক্সবাদীরা চুপ করেই হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছেন। এই ভারত জুট প্রসেস নিয়ে বলতে গিয়ে তাহলে আরও একটি কথাও বলে নেওয়া ভালো। ভারত জুট প্রসেস যে কনভারশন প্রদ্ধতি অনুযায়ী এখন চলছে, সেই একই পদ্ধতিতে অতীতে কেন্দ্রীয় সরকারের এন জে এম সি-ও তাদের মিলগুলি চালানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা এই মার্ক্সবাদীরাই করেছিল। অথচ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেই মার্ক্সবাদীরাই কনভারশন প্রক্রিয়া অনুযায়ী তাদের মিলটির পরিচালনভার তুলে দিয়েছে ব্যক্তি মালিকের হাতে।

ক্ষমতায় এসে তাঁদের পুরনো প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাওয়া, রাতরাতি শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা—মার্ক্সবাদী নেতাদের কথাবার্তায় বারেবারেই তা

ফুটে উঠেছে। হাওড়ার পরেশ মালের ঘটনায়, গৌরীশঙ্কর জুট মিলে পুলিশের গুলি চালনার ঘটনায় বা ভিক্টোরিয়া এবং কানোরিয়া জুট মিলের ঘটনার পর মার্ক্সবাদী নেতাদের মন্তব্যে এই মনোভাব বারেবারেই ধরা পড়েছে। বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ বা রুগ্ন হয়ে গিয়ে যেসব শ্রমিকরা কর্মচ্যুত হয়ে পড়েছেন, তাদের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নে এই মার্ক্সবাদী সরকারের শ্রমমন্ত্রীই বলেছেন, 'আমাদের তো কেন্দ্রের মত টাকা ছাপানোর মেশিন নেই যে ইচ্ছে মতো ছাপিয়ে নেব।' কোনও সহানুভূতি নয়, গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি অনুধাবণ করাও নয়। নিতান্তই পাশ কাটিয়ে যাবার মত একটি বক্তব্য মার্ক্সবাদী সরকারের শ্রমমন্ত্রীর!

শ্রমিকদের প্রতি মার্ক্সবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় ঠেলে দিল শ্রমিকদের? আরও দু-একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করি। দমদমের অ্যালুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারার্স কোম্পানি এগারোশো শ্রমিক-কর্মচারীর রুটি-রুজির সংস্থান করতো। ১৯৮৪ সালে এই কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেল। এরপর এই কারখানার সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দেওয়া হল ওরিয়েন্টাল সেলস এজেন্সি নামক একটি সংস্থার কাছে। অ্যালুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারার্স কোম্পানি (অ্যামকো)-র দরজা আজ অবধি খোলেনি। উল্টে উত্তর চব্বিশ-পরগনা জেলার মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতার সঙ্গে যোগসাজশে কারখানার ওই জমিতে পার্ক এবং সুপারমার্কেট বানিয়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন এক প্রোমোটার। ইতিমধ্যে অবশ্য অনাহার এবং দারিদ্রের জ্বালায় অ্যামকোর প্রায় পঞ্চাশ জন শ্রমিক মারা গিয়েছেন। বাকিরা রাস্তায় ভিক্ষা করতে নেমেছেন। মার্ক্সবাদী সরকার কিন্তু নীরব দর্শকের মতোই গোটা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে গেছেন।

নৈহাটি-জগদ্দল এলাকার গৌরীপুর জুট মিলে প্রায় দশ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার মাত্র দশবছর পরে ১৯৮৭ সালে মিলটিতে ক্লোজার ঘোষণা করেন মালিকপক্ষ। কারখানার যন্ত্রপাতিও বেচে দেবার চেষ্টা করা হয়। শ্রমিকরা তাতে বাধা দিতে গেলে মালিকপক্ষের মস্তানদের হাতে আক্রান্ত হন। শেষ পর্যন্ত একহাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করে মিলটির এক নম্বর ইউনিটটি খোলে। দু'নম্বর ইউনিটটি অবশ্য এখনও বন্ধ। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং গ্যাচুইটি কিছুই দিতে রাজি হননি। মার্ক্সবাদী সরকার সব জেনেশুনেও চুপ করে রয়েছেন। তেমনি, শ্যামনগরের ডানবার কটন মিল ১৯৮৭ সাল থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা এখন রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন। মার্ক্সবাদী সরকার এক্ষেত্রেও নীরব। এইসব ঘটনাগুলিই বলে দিচ্ছে, মার্ক্সবাদীদের আমলে শ্রমিক-কর্মচারীর অবস্থা কতখানি অসহায় এবং অসহনীয় হয়ে উঠেছে এই রাজ্যে!

এক্ষেত্রে একটি কথা বলার আছে যে, জনকল্যাণমুখী এবং পরিষেবামূলক কাজে কিন্তু মার্ক্সবাদীদের আগ্রহ প্রথম থেকেই দেখা যায়নি। শুধু শ্রমিকের স্বার্থ দেখা নয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থের প্রতিও এই অনীহাই মার্ক্সবাদীরা দেখিয়েছেন। তারও একটি উদাহরণ এখানে তুলে দিচ্ছি। আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থা থেকে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের ঋণ নেওয়ার বিরোধিতা বরাবরই মার্ক্সবাদীরা করেছেন। এই বিরোধিতা এখনও তাঁরা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া অর্থনীতির ফলে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থাগুলি থেকে ঢালাও ঋণ নিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার দেশকে বিকিয়ে দিতে চাইছেন—এটাই প্রধান অভিযোগ মার্ক্সবাদীদের।

এই অভিযোগে এর আগে মার্ক্সবাদীরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো সব আন্দোলন করেছেন। এমনকি, সম্প্রতি গ্যাট চুক্তির প্রতিবাদে তাঁরা বাংলা বন্ধ এবং রেল রোকোও করেছেন। কিন্তু, আবার বাস্তব ঘটনা হল, এই মার্ক্সবাদীরাই এখানে ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির কাছ থেকে ঢালাও ঋণ নিয়েছেন। এই রাজ্যে, মার্ক্সবাদীদের আমলেই বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির থেকে সাহায্য নিয়ে এগারোটা প্রকল্প চালু আছে। এই এগারোটা প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই ৯,৫০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। ৯৮ সালের ভিতরে এই প্রকল্পগুলির জন্য ঋণ দেওয়া হবে আরও ১,১১৬ কোটি টাকা। এই ঋণের সুদ বাবদ ৯১-৯২ বাজেটে রাজ্য সরকারকে সরিয়ে রাখতে হয়েছিল ২০০ কোটি টাকা। এই ২০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে যোগাড় করতে হয়েছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি খাতে ব্যয় কমিয়ে। এককথায় জনমুখী এবং পরিষেবামূলক খাতেই কিন্তু ব্যয়বরাদ্দ কমিয়েছিল মার্ক্সবাদী সরকার। এতে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, ৭৭ সাল থেকে সবক্ষেত্রেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন ব্যাপকভাবে পাল্টে গেছে যে, শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের স্বার্থকেও আজ তাঁরা অন্যভাবেই দেখেন। আর এভাবে দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে বলেই, মার্ক্সবাদী শ্রমমন্ত্রী বা নেতারা ওইসব হালকা কথাবার্তা বলতে দ্বিধা বোধ করেন না।

শ্রমিক-কৃষক খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ যখন দলিতই হয়েছেন এভাবে মার্ক্সবাদী সরকারের সতের বছরের শাসনকালে, তখন কিন্তু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ-র বিলাস-বৈভব কিছু কমেনি, বা থমকে যায়নি। জেলায় জেলায় এবং কলকাতায় সি আই টি ইউ-র প্রাসাদোপম বাড়ি উঠেছে। সি আই টি ইউ-র নেতাদের জন্য নিত্য নতুন গাড়ি এসেছে। সি আই টি ইউ-র রাজ্য এবং জেলা সম্মেলনগুলিতে এলাহি খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। জলের মতো টাকা খরচ হয়েছে এইসব সম্মেলনগুলির পিছনে। কিন্তু এই অসহায় শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে গত সতের বছরে কোনও গঠনমূলক পদক্ষেপই নেয়নি মার্ক্সবাদীদের সরকার।

৯১ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতেও মার্ক্সবাদী এবং বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে বলা হয়েছিল, 'শিল্প বিরোধগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করা। বন্ধ কলকারখানাগুলি খোলার ব্যাপারে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা। শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য শিল্পসম্পর্কিত আইনগুলির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। নূন্যতম মজুরি আইন বলবৎ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। কর্মচারী বীমা প্রকল্প সম্প্রসারিত করা। সংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া। শ্রমিকদের বাসস্থান ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের প্রসার ঘটানো। কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির গণতন্ত্রীকরণ।' কিন্তু এইসব কথাগুলি আসলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিই রয়ে গেছে। ৭৭ থেকে ৯১ সাল অবধি এই কর্মসূচির কোনটাই যেমন পালন করেনি মার্ক্সবাদীরা, তেমনই ৯২ থেকে আজ পর্যন্তও পালন করেনি। পালন করা তো দূরের কথা, এই কর্মসূচি নিয়ে বিশেষ আর কোনও ঐকান্তিকতা বা উৎসাহই দেখা যায়নি মার্ক্সবাদীদের ভিতর। তাই সতের বছর পর মার্ক্সবাদীদের সম্বন্ধেও শ্রমিক শ্রেণীর মোহভঙ্গ ঘটছে। শিল্পাঞ্চলে ভোট বাড়ছে বিরোধীদের। বিভিন্ন কল-কারখানায় এখন মার্ক্সবাদী শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধেও মালিকের সঙ্গে গোপন আঁতাতের অভিযোগ উঠছে। ভিক্টোরিয়া, কানোরিয়া, অ্যাঙ্গাস, কেলভিন, নিউ সেণ্ট্রালের

মত সংস্থাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও অস্বীকার করার প্রবণতা তাই দেখা দিচ্ছে শ্রমিকদের ভিতর।

এগারো

এই অবধি আলোচনায় অন্তত এটুকু পরিষ্কার হচ্ছে যে, বড় বড় কয়েকটি প্রশ্নেই গত সতের বছরে মার্ক্সবাদীদের চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটাই বদলে গেছে। অনেকটা না বলে, বলা ভালো আমূলই বদলে গেছে। মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষা, বামপন্থী জীবনযাপন—এই প্রধান ক্ষেত্রগুলিতেই ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার আগে মার্ক্সবাদীরা যে কথা বলেছিলেন, তার সঙ্গে এই ৯৪ সালে সতের বছর ক্ষমতায় কাটানোর পর মার্ক্সবাদীদের কথাবার্তার কোনও মিলই নেই। মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষা, বামপন্থী জীবনযাপন-মার্ক্সবাদীদের আমূল বদলে যাবার আরও হাজার হাজার উদাহরণ ইচ্ছে করলেই টানা যায়। কিন্তু, উদাহরণে আর ভারাক্রান্ত না করে এবার আমরা বরং সঠিকভাবে এই রাজ্যের অবস্থাটি কী দাঁড়িয়েছে তা একটু দেখতে চেষ্টা করি।

৭৭ সালের আগে এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারগুলি সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের অন্যতম অভিযোগ ছিল, এই কংগ্রেস সরকারের প্রশাসনিক কাজকর্ম অপদার্থতায় ভরা। প্রশাসনে দুর্নীতি, গাফিলতি, জনগণের ক্ষোভগুলির প্রতি মনোযোগ না দেওয়া এইসব অভিযোগই ছিল মার্ক্সবাদীদের। অবশ্য, কংগ্রেসের সরকার দুর্নীতিগ্রস্তদের সরকার—এই অভিযোগ কিন্তু মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার পরও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অব্যাহত রেখেছিল। তাই ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার আগে মার্ক্সবাদীরা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ক্ষমতায় এসে দুর্নীতিমুক্ত একটি সচল সরকার গড়ার কথাই বলেছিল। যে ৩৬ দফা কর্মসূচি তখন মার্ক্সবাদীরা পেশ করেছিল জনগণের সামনে, তাতে বলা হয়েছিল, 'যৌথ কাজকর্ম, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও দক্ষতা, ফাইলের চলাচলের গতি বাড়ানো, ঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা এবং জনগণের ক্ষোভগুলির প্রতি বাড়তি মনযোগ দানের জন্য কর্মচারী সংগঠনগুলির সাহায্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা; দুর্নীতির অভিযোগগুলির সম্পর্কে আরও দ্রুত এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভিজিলেন্স ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো।' ৩৬ দফা কর্মসূচিতে এই যে কথাগুলি বলা হয়েছিল, তা সত্যিই খুব ভালো ভালো কথাবার্তা। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, গত সতের বছরে মার্ক্সবাদীরাও একদিনের জন্যও তাদের সরকারি প্রশাসনকে সচল, গণমুখী বা দুর্নীতিমুক্ত করতে পারেনি।

গত সতের বছরে রাজ্য সরকারের প্রশাসনও তাই গয়ংগচ্ছভাবেই চলেছে। প্রশাসনের কোনও স্তরকেই গণমুখী, কর্তব্য সচেতন, দায়িত্ব সম্পন্ন করে তোলা যায়নি। অর্থাৎ, যে অভিযোগ আগের সরকারগুলির প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্বন্ধে মার্ক্সবাদীদের ছিল, ক্ষমতায় আসার সতের বছর পর সে অভিযোগগুলি থেকে আজ তারাও মুক্তি পেতে পারে না। প্রশাসনিক কাজকর্মের উন্নতি ঘটাতে যে মার্ক্সবাদীদের সরকার ব্যর্থই হয়েছে—তা অবশ্য মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা কেউই ঢেকে

রাখতে পারছেন না। রাজ্য প্রশাসনের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেও স্বয়ং স্বীকার করতে হচ্ছে তাঁর সরকারের এই প্রশাসনিক ব্যর্থতার দিকটি। ক্ষমতায় আসার পর তাঁর প্রশাসনের এই হাল দেখে তাই জ্যোতি বসুকেও বলতে হয়েছে, 'সাধারণ মানুষ সরকারি কর্মচারীদের কাছ থেকে কোনও সাহায্যই পান না। বিশেষ করে এই সরকার যেখানে আমাদের সমর্থক কর্মচারীদের সংখ্যা বিরাট। আমাদের সমর্থক কর্মচারীদের তো এ ব্যাপারে একটি বিরাট দায়িত্ব রয়েছে।' শুধু কি এই? মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে জ্যোতি বসু সখেদে এও বলেছেন, 'কাকে কাজ করতে বলব? চেয়ার টেবিলকে?'

নিজেদের দলের সমর্থক সরকারি কর্মচারীদেরও যে কর্তব্য সচেতন করা যায়নি সেটা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও স্বীকার করেছে। ১৯৮২ সালে দলের রাজ্য সম্মেলনের সময় প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে, 'নানারকম সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও আমাদের সমর্থক কর্মচারীরা দায়িত্ব সচেতনভাবে কাজ করছেন না। বরং তাঁরা সেই পুরনো গয়ংগচ্ছভাবেই চলছেন। এঁরা এটাই বুঝতে পারছেন না যে, এই ধরনের কাজ সরকারের ভাবমূর্তিই মলিন করে। একটা বড় অংশের সরকারি কর্মচারীদের থেকে আমরা সমর্থন পাই ঠিকই। কিন্তু তাঁদের কাজের অনীহা, জনগণের প্রতি অবহেলা, দুর্নীতি প্রসারের ফলে সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণে বাধা আসে।'

প্রশাসনের এই হাল যে মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় এসে ফেরাতে পারেননি তা সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন। রস মালিক (Ross Mallick) তাঁর 'ডেভেলপমেন্ট পলিসি অফ এ কমিউনিস্ট গভর্ণমেন্ট' বইয়ে লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা কাজে আসে এক-দুঘন্টা দেরী করে, যায় ছুটির এক-দুঘন্টা আগেই।' সরকারি কর্মচারীদের কাজ সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা, যা রস মালিকের হয়েছিল, তা প্রতিটি পশ্চিমবঙ্গ বাসীর আছে। সকাল দশটায় কোনও সরকারি অফিসে গেলে কোনও কর্মচারীরই দেখা পাওয়া যায় না। আবার বিকেল তিনটার পরই অফিস ফাঁকা হতে থাকে। এর ভিতর গল্প-গুজব-মিটিং-মিছিল রয়েছে। এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে ফাইল যেতেই মাস কাবার হয়ে যায়। টেবিলের ওপর ফাইল জমে পাহাড় হতে থাকে। এরপর রয়েছে ঘুস। এমন অনেক সরকারি অফিসই রয়েছে, যেখানে ঘুস না দিলে ফাইলই চলে না। প্রবীণ মার্ক্সবাদী নেতা কমল বসু যখন কলকাতা পুরসভার মেয়র ছিলেন, তখন খোদ কমল বসুর জামাতাকেই পুরসভায় ঘুস দিয়ে কাজ করাতে হয়েছিল। খোদ মেয়রের জামাইকে যেখানে ঘুস দিতে হয়, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা তো সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থা দেখে আরও তিক্ত ভাষায় যোসেফ লেলিভেল্ড তাঁর 'ক্যালকাটা' বইয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'next to the interest of his family, the public interest does not exist'.

অথচ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ভিতর সবথেকে বড়ো সংগঠন কিন্তু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিরই। মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর তাঁদের সমর্থক কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মাইনেও অনেক বাড়িয়েছেন। মাইনে বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাঁদের দায়িত্ববোধ বাড়াতে পারেননি। মাইনে বাড়ানোর আন্দোলনের পাশাপাশি কাজে ফাঁকি দেওয়ার যে প্রবণতা সরকারি কর্মচারীদের ছিল, যার নিন্দাই

করতেন মার্ক্সবাদীরা, তা এখনও রয়ে গেছে। আসলে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক এই সরকারি কর্মচারীদের এমনই ধারণা ছিল এবং এখনও আছে যে, 'আমাদের সরকার ক্ষমতায় থাকলে কাজ না করলেও আমাদের ছাড়।' কিন্তু সার্থক সমাজতন্ত্র আনতে হলে যে কাজে ফাঁকি দেওয়াটা দন্ডনীয় অপরাধ এই বোধটাই তাঁদের সমর্থকদের ভিতর জাগিয়ে তুলতে মার্ক্সবাদীরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাই, কোঅর্ডিনেশন কমিটিও বারবার সময় মতো হাজিরা এবং দায়িত্ব সহকারে কাজ করার কথা তার সমর্থকদের বললেও, সমর্থকরা তা কানে তোলেন না।

এরই ভিতর আবার সরকারি আমলা এবং অফিসারদের একটি অংশকে মার্ক্সবাদীরা নিজেদের তাঁবেদার বানিয়ে ফেলেছেন। সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে সুখে সাছন্দ্যে থাকার জন্য এই আমলা এবং অফিসাররাও আবার শাসক দলের মর্জিমতোই কাজ করে যাওয়াকে শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি কাজকর্ম নিরপেক্ষভাবে হচ্ছে না। সরকারি কাজে পার্টির হস্তক্ষেপ ঘটছে। এবং তার ফলে সরকারি কাজ ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে। আমলা এবং অফিসারদের একাংশের এভাবে পার্টির তাঁবেদার বনে যাওয়াটাও রস মালিক প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এবং তাঁর বইতে তিনি সে কথা উল্লেখও করেছেন।

প্রশাসনিক কাজকর্ম এভাবে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়ে ভেঙে পড়লে সাধারণ মানুষের কী নিদারুণ দুর্দশা হতে পারে, তা রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের দশ বারো বছর কেটে যাবার পরও প্রশাসনিক গাফিলতি, অপদার্থতা, ব্যর্থতা, লাল ফিতের ফাঁস এসব কারণে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নায্য পাওনা গন্ডা পেতে দশ বারো বছর, কি তারও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। এ জন্য অনেক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকই অনাহারে-অর্ধাহারে মারা গেছেন। অনেককে ভিক্ষা করেও দিন গুজরান করতে হচ্ছে। অথচ প্রশাসন যে একটু সচল হলে কাজ করতে পারে না এমন তো নয়। অনেক মার্ক্সবাদী নেতা বা মার্ক্সবাদী মন্ত্রী যাঁরা একসময়ে শিক্ষকতা করতেন তাঁরা আবার অবসর গ্রহনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের নায্য পাওনা পেয়ে যাচ্ছেন। প্রশাসনটা যে শুধু নিজেদের দেখাশোনা করার জন্য নয়, জনগণের সেবা করার জন্য—সতের বছরে মার্ক্সবাদীরা সেই সারসত্যটাই প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। রস মালিক বলেছেন, 'কংগ্রেস জমানার থেকেও প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে মার্ক্সবাদীদের আমলে।' রস মালিকের মতে, 'আমলাদের ভিতর নিজেদের পার্টির প্রভাব বাড়াতে গিয়ে মার্ক্সবাদীরা নিজেরাই নিজেদের দক্ষতাকে কবর দিয়েছেন।'

সাধারণ প্রশাসনে মার্ক্সবাদীদের এই চূড়ান্ত ব্যর্থতাই কিন্তু সবত্র নৈরাজ্য ডেকে এনেছে। সরকারে আসার আগে যে আমলাতান্ত্রিকতার বিরোধী ছিলেন মার্ক্সবাদীরা-সেই আমলাতান্ত্রিকতাকে তাঁরা তো দূর করতে পারেনইনি, উল্টে সেই আমলাতান্ত্রিকতার শিকার হয়েছেন দিনের পর দিন। এর ওপর সাধারণ প্রশাসনে এই যে দুর্নীতি, কর্মবিমুখতা গেঁড়ে বসেছে—সর্বত্রই এটা ছড়িয়েছে। সাধারণ প্রশাসন শক্ত হতে পারেনি বলেই আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রটিতেও নৈরাজ্যই দেখা গিয়েছে মার্ক্সবাদীদের শাসনের সতের বছরে।

অথচ, এই আইনশৃঙ্খলার বিষয়টিই একটি স্পর্শকাতর ইস্যু ছিল ৭৭-এ মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার আগে। ৭২-৭৭, এই পাঁচবছরে কংগ্রেসি শাসন আমলে, এবং

তারও আগে ৬৭-৬৯ থেকে যে রাজনীতি শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, সেই রাজনীতির সূত্র ধরেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছিল এখানে। ৭২-৭৭-এ সে নৈরাজ্য চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল। ৭৭-এ ক্ষমতায় আসার আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই অবনতিকেই মার্ক্সবাদীরা বড়ো ইস্যু করে তুলেছিলেন। ক্ষমতায় এসে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো তাঁদের একটি প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। একথা ঠিকই যে, ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর মার্ক্সবাদীরা বিরোধী কংগ্রেসের ওপর পাল্টা আঘাত হানতে নামেননি। সে কৃতিত্ব অবশ্য মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তর। প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর সহযোগী নেতারা সেই সময় অন্তত এটি বুঝেছিলেন, পাল্টা আঘাত হানতে নামলে ৬৭-৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট সরকারের মতোই দশা হবে ৭৭-এর বামফ্রন্ট সরকারের। কাজেই সে ভুল প্রমোদবাবু এবং তাঁর সহযোগী নেতারা করতে দেননি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডারদের।

কিন্তু, তারপর যত বছর কেটেছে মার্ক্সবাদীদের চরিত্রে দ্রুত বদল ঘটেছে। মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় টিকে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেনোজলের মতই শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকার জন্যই নানাবিধ মস্তান এবং সমাজবিরোধীরা তাদের আশেপাশে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক আনুগত্য পাল্টে মস্তান এবং সমাজবিরোধীরা মার্ক্সবাদী নেতাদের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছে। এবং ভোটের রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য মার্ক্সবাদী নেতারাও তাঁদের পুরনো চরিত্র বিস্মৃত হয়ে গিয়ে ভোল বদলানো এই মস্তান এবং সমাজবিরোধীদের রাজনৈতিক আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছেন। মার্ক্সবাদীদের এই অবস্থা দেখেই প্রবীণ মার্ক্সবাদী নেতা পীযূষ দাশগুপ্ত তাঁর 'সি পি আই (এম) সংগ্রামের মধ্যে জন্ম ও বৃদ্ধি, মহাকরণের কক্ষে প্রবেশ ও সিদ্ধি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'যে কোনও মূল্যে ক্ষমতায় থাকাটাই এখন মার্ক্সবাদী নেতাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এত সরব ছিলেন এই মার্ক্সবাদীরা, তাঁদের শাসন আমলেই রাজ্যের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলার চিত্রটি তাহলে কেমন হয়ে দাঁড়ালো? কেমন হয়ে দাঁড়ালো তা বোঝানোর জন্যই গোটা কয়েক ঘটনা এখানে তুলে ধরছি। নৈহাটির গরিফা এলাকা সমাজবিরোধীদের একটি মস্ত ঘাঁটি। এমন কোনও দুষ্কর্ম নেই যা সমাজবিরোধী-মস্তানরা এখানে করে বেড়ায় না। খুন-জখম-লুটতরাজ-ধর্ষণ সবই এখানে চলে অবাধে। এই অঞ্চলের বিধায়ক মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জগদীশ দাস। যে সমাজবিরোধীরা এই অঞ্চলে তাণ্ডব করে বেড়ায়, তারা সকলেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতাদের ছত্রছায়ায় লালিত পালিত। সমাজবিরোধী মস্তানদের পিছনে এই রাজনৈতিক মদত থাকায় পুলিশও এদের ঘাঁটাতে সাহস পায় না। ফলে সাধারণ মানুষদের এই মস্তান-সমাজবিরোধীদের হামলা সহ্য করেও মুখ বুজে থাকতেই হয়। এই অঞ্চলেই এস ডি পি ও হয়ে এসেছিলেন এক তরুণ আই পি এস অফিসার সঞ্জয় মুখার্জি। রাজনৈতিক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই তিনি নির্মম হস্তে মস্তান দমন করার কাজে নেমে পড়েন। তাঁর এই কাজে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থনও পান। কিন্তু সঞ্জয় মুখার্জির এই কাজে চটে যায় স্থানীয় রাজনৈতিক মহল। ৯৪ সালেই একদিন বিধায়ক জগদীশ দাস তাঁর শ'দুয়েক সমর্থক নিয়ে চড়াও হন গড়িফা পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশ ফাঁড়িতে বিধায়কের অনুগামীরা ব্যাপক ভাঙচুর করে। ওই তরুণ

আই পি এস অফিসারকে দেখে নেবার হুমকি দেন বিধায়ক। স্থানীয় মানুষ অবশ্য তখন সঞ্জয় মুখার্জির সমর্থনে রাস্তায় নেমে পড়ে। রাজনৈতিক মহলের হুমকিতে সঞ্জয় মুখার্জিকে বদলি করা চলবে না-এমন পোস্টারও পড়ে। অবশ্য এর পরে সঞ্জয় মুখার্জিকে সত্যি সত্যিই বদলি হয়ে যেতে হয়েছে। এবং সঞ্জয় মুখার্জির সময়ে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ওখানে যেটুকু বন্ধ হয়েছিল তা আবার জাঁকিয়ে বসেছে।

খোদ কলকাতা শহরের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি এখন কেমন! ৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই এক সন্ধ্যেবেলায় ইডেন উদ্যানের সামনে আউটরাম ঘাটের কাছে একদল সমাজবিরোধী বাইকে চেপে এসে পরপর বেশ কয়েকজন ব্যক্তির কাছ থেকে ছিনতাই করে। যাঁরা ছিনতাইকারীদের বাধা দিতে গিয়েছিলেন, তাঁরা আক্রান্ত হন সমাজবিরোধীদের হাতে। ঘটনাস্থলের কাছেই কর্তব্যরত পুলিশ সার্জেন্টও ছিলেন। আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে গেলে তিনি এড়িয়ে যান। এর দু-দিন পরেই অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসে। এক দম্পতি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস দিয়ে মোটরবাইক চেপে রাতে বাড়িতে ফিরছিলেন। বেলেঘাটার কাছে একদল সমাজবিরোধী তাঁদের আটকায়। ভদ্রলোককে বেদম মারধর করে সমাজবিরোধীরা। ভদ্রমহিলাকে তাঁরা টানতে টানতে রাস্তার ধারে মাঠের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ভদ্রমহিলা চেঁচাতে শুরু করলে সমাজবিরোধীরা তাঁর অলঙ্কার ছিনতাই করে পালায়। কাছেই পুলিশের একটি টহলদারি ভ্যান ছিল। আক্রান্ত দম্পতি সেই টহলদারি ভ্যানের পুলিশ কর্মীদের কাছে গিয়ে ঘটনার কথা জানালে তাঁরা নির্বিকারভাবে তাঁদের বিধাননগর থানায় যেতে বলেন। আক্রান্ত দম্পতি এর পর ছুটে যান বিধাননগর থানায়। বিধাননগর থানা তাঁদের পাঠায় তিলজলা থানায়। এমনভাবে দেড়ঘন্টা দৌড়াদৌড়ি করার পর পুলিশের কাছে তাঁদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করাতে তাঁরা সমর্থ হন।

এই ৯৪ সালেই সরস্বতী পুজোর আগের দিন বড়তলা থানা এলাকায় একটি নক্কারজনক ঘটনা ঘটে। ওইদিন সন্ধ্যাবেলায় বড়তলা থানা এলাকায় গোয়াবাগান স্ট্রিটের বাসিন্দা আলপনা ব্যানার্জি বাড়ি ফিরছিলেন। এর কিছুদিন আগে থেকেই আলপনা ব্যানার্জির সঙ্গে বাড়ির দখল নিয়ে স্থানীয় কিছু সমাজবিরোধীর গণ্ডগোল চলছিল। এই সমাজবিরোধীরা আবার মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতাদের মদতপুষ্ট বলে পরিচিত। সন্ধ্যেবেলা আলপনা ব্যানার্জি বাড়ি ফেরার পথে এই মস্তানরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রকাশ্যে রাস্তায় তাঁকে ফেলে মারতে থাকে মস্তানেরা। মারতে মারতে তাঁকে প্রায় উলঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাঁর কিশোর পুত্র ছুটে এলে তাকেও মস্তানরা আটকে রাখে। মারতে মারতে রাস্তায় ফেলে আলপনা ব্যানার্জির মুখের ওপর মদ ঢেলে দেয় মস্তানরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের শাসানো হয়, বাঁচাতে এলে পরিণাম ভালো হবে না। প্রায় দুঘন্টা ধরে প্রকাশ্য রাস্তার ওপর এই হামলা চলে। ঘটনাস্থল থেকে বড়তলা থানা ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। পুলিশে খবর দিলে পুলিশ অজুহাত দেখায়, গাড়ি নেই, তাই যাওয়া যাবে না। ঘটনা মিটে যাবার অনেক পরে পুলিশ আসে। এই বড়তলা থানার বিরুদ্ধেই মস্তান এবং সমাজবিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত করে চলার অভিযোগ রয়েছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে বেহালায়। এখানেও এক গৃহবধূ তাঁর বাড়িতেই পাড়ার মস্তানদের হাতে লাঞ্ছিতা হন। এরপর স্থানীয় মার্ক্সবাদী

নেতারা এবং পার্টি ক্যাডারেরা ওই পরিবারটিকে ক্রমাগতই শাসাতে থাকে, মুখ খুললে ফল ভালো হবে না। এমনকি, স্থানীয় থানাও উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে গড়িমসি করে। কয়েকবছর আগে খোদ কলকাতার চৌরঙ্গি এলাকা থেকেই এক বার-গায়িকাকে কিছু সমাজবিরোধী অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে পার্কসার্কাসের একটি ঝুপড়িতে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। কয়েক বছর আগে উত্তর কলকাতার একটি সিনেমা হলে একদল সমাজবিরোধী একজন মহিলাকে উত্যক্ত করতে থাকলে এক তরুণ বাধা দিতে এগিয়ে যান। সমাজবিরোধীরা তাকে ছুরি মেরে পালায়। মেট্রো রেলের রবীন্দ্রসদন স্টেশনের সামনেও একদল সমাজবিরোধী এক মহিলাকে লাঞ্ছনা করার চেষ্টা করে। এক মহিলা সাংবাদিক তখন সাহসে ভর করে এসে ওই মহিলাকে বাঁচান।

বানতলার সেই লজ্জাজনক ঘটনা তো সকলেরই মনে আছে। ১৯৯১ সালের জুন মাসে কলকাতার উপকণ্ঠে বানতলায় এই লজ্জাজনক ঘটনাটি ঘটেছিল। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ইউনিসেফের তিন মহিলা অফিসার অনিতা দেওয়ান, রেণু ঘোষ এবং উমা ঘোষ একটি কাজ সেরে গাড়িতে করে কলকাতার দিকে ফিরছিলেন। তাঁদের গাড়ি চালাচ্ছিলেন স্বাস্থ্যদপ্তরের গাড়ির চালক অবনী নাইয়া। বানতলায় আসতেই একদল লোক তাঁদের গাড়ি ধাওয়া করে। পালাতে গিয়ে তাঁদের গাড়িটা উল্টে যায়। এরপর বেশ কিছু লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে এই চারজনের ওপর। ওইদিন বানতলায় হাট বসেছিল। বিকেলবেলা হাট যখন জমজমাট, তখন হাটের কাছেই রাস্তার ধারে একটি মাঠে এই হামলার ঘটনা ঘটে। তিন মহিলাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে উলঙ্গ করে দেওয়া হয়। তারপর তাঁদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলে। বাধা দিতে গিয়ে ড্রাইভার অবনী নাইয়াও আক্রান্ত হন। ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরেই ছিল পুলিশ ফাঁড়ি। খবর পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ আসেনি। পুলিশ আসে সব ঘটনা মিটে যাবার পর। এই ঘটনায় আক্রান্ত মহিলাদের ভিতর অনিতা দেওয়ান এবং ড্রাইভার অবনী নাইয়া মারা যান। রেণু ঘোষ এবং উমা ঘোষ দীর্ঘদিন মারাত্মক আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। হাসপাতাল সূত্র থেকে জানা গেছে, আক্রান্ত মহিলাদের যখন হাসপাতালে আনা হয়, তখন তাঁদের দেহে একটুকরো কাপড় ছিল না। সকলেই মারাত্মক জখম এবং অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। সারা শরীর থেকে তাঁদের রক্ত ঝরছিল। হাসপাতাল সূত্রেই আরও জানা গেছে, আক্রান্ত মহিলাদের যোনিদেশে টর্চ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্তনের ওপর ছিল গভীর ক্ষতচিহ্ন। আর এই ভয়াবহ ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মন্তব্য করেছিলেন, 'এরকম তো কতোই হয়ে থাকে।'

ওই বছরই বিরাটিতে গণধর্ষণের একটি ভয়াবহ ঘটনাও ঘটেছিল। বিরাটি রেল লাইনের ধারে ঝুপড়িগুলিতে চড়াও হয়ে স্থানীয় এক সমাজবিরোধী এবং তার শাকরেদরা ঝুপড়িবাসী মহিলাদের দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেছিল। এই সমাজবিরোধীটি আবার মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতাদের মদতপুষ্ট এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একটি শাখা সংগঠনের সঙ্গে জড়িতও ছিলো। এই ঘটনার পর বিরাটিতে এসে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সংগঠনের নেত্রী শ্যামলী গুপ্ত ওই ধর্ষিতা মহিলাদের চরিত্র নিয়েই কটাক্ষ করে গিয়েছিলেন। এরকম ভয়াবহ গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে মালদা জেলার গদাইচরেও। ওখানেও নৌকার যাত্রী মহিলাদের নামিয়ে গণধর্ষণ করে পালিয়ে

গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এবং অভিযোগ উঠেছিল, ওই গণধর্ষণের ঘটনাকে চেপে রাখতেই নাকি চেয়েছিল স্থানীয় পুলিশ।

৯৪ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর চব্বিশ-পরগনার গাইঘাটায় ফরওয়ার্ড ব্লকের এক নির্বাচিত মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যা নিগৃহীতা হয়েছেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় মস্তানদের হাতে। ঘটনার বিবরণে এটাই প্রকাশ পেয়েছে, স্থানীয় একটি বচসার মীমাংসা করতে গেলে ওই পঞ্চায়েত সদস্যাকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী বলে পরিচিত কিছু যুবক আক্রমণ করে। পঞ্চায়েত সদস্যার মাথায় লোহার রড এবং চেন দিয়ে আঘাত করা হয়। আঘাত পেয়ে মাটিতে পরে যাবার পর হামলাকারীরা তাঁকে বিবস্ত্র করে দেয়। তিনমাসের গর্ভবতী ওই পঞ্চায়েত সদস্যার পেটে লাথি মারা হয়। ঘটনাস্থলেই গর্ভপাত হয়ে যায় তাঁর। কয়েকজন প্রতিবেশী এবং পরিবারের লোকজন পঞ্চায়েত সদস্যাকে অটোরিক্সায় চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা আবার হামলা চালায়। শেষ পর্যন্ত ওই পঞ্চায়েত সদস্যাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সমাজবিরোধীদের সঙ্গে শাসক রাজনীতিবিদদের গাঁটছড়ার বিষয়টিও জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে এই সতের বছরে। জগদীশ দাসের ঘটনার মতোই অজস্র ঘটনা গত সতের বছরে ঘটেছে, যেখানে প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে সমাজবিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের আঁতাতের চিত্রটি। সেই সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেছে রাজ্যের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার চেহারাটিও। একেবারে সাম্প্রতিক দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ৯৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে শ্যামবাজার এলাকার এক সাট্টা ডনকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ বাহিনী অভিযান চালায়। পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আই পি এস অফিসার নজরুল ইসলাম। সাট্টা ডনের যে সাকরেদকে পুলিশ ধরেছিল তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েই পুলিশ অভিযান চালায়। কিন্তু শ্যামবাজারে ওই সাট্টা ডনের ডেরায় পুলিশ অভিযান চালাতে এসেই বাধা পায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতা এবং কর্মীদের কাছ থেকে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় পাঁচ শো কর্মী এবং স্থানীয় নেতারা পুলিশ বাহিনীকে ঘিরে ধরে। পুলিশ বাহিনীর হেপাজত থেকে সাট্টা ডনের ধৃত সাকরেদকে ছিনিয়ে যায় পার্টি কর্মীরা। এই অবসরে সাট্টা ডন গা ঢাকা দেয়। পুলিশ পার্টি কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে, এই অভিযোগ করেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। পুলিশের সমালোচনা করে ওই এলাকায় একটি জনসভাও করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি।

এই ৯৪ সালেরই অক্টোবর মাসে পূর্ব কলকাতার বেনেপুকুর থানা এলাকায় এক খুনের আসামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে পুলিশকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী-সমর্থকদের রোষের মুখে পড়তে হয়। যে ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল সেই ব্যক্তি এলাকার মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী। তাকে গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যারা দলে দলে পার্কসার্কাসে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সামনে জড়ো হন। এঁদের নেতৃত্ব দেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিরই দুই পুরপিতা বাদল কর এবং জয়শ্রী দেব নন্দী। টানা সাত ঘন্টা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এই কর্মী সমর্থকরা পথ অবরোধ করে রাখেন। পথ অবরোধ থেকে শ্লোগান দেওয়া

হয়, 'বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশি চক্রান্ত রুখছি, রুখব।' এই অবরোধ সরাতে পুলিশ কোনও উদ্যোগই নেয়নি।

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙার পর ৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, তখনও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির চেহারাটাই ধরা পড়েছে সকলের চোখের সামনে। ট্যাংরার ধোবিয়াতলা, বিবিবাগান, মেহের আলি লেন, দক্ষিণে গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে ৯২ সালের ৭ ডিসেম্বরের পর। ব্যাপক বোমাবাজি, লুটতরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে। দাঙ্গার সুযোগ নিয়ে এলাকার সুপরিচিত মস্তানরা নেমে পড়ে লুটতরাজ করতে। ধোবিয়াতলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনায় যারা জড়িত ছিল তাদের অনেকেই আবার এলাকায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পরিচিত কর্মী। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী ১০ ডিসেম্বর সকালে যারা বস্তি জ্বালাতে এবং লুট করতে ছুটে এসেছিল, সেই কাশিয়া, দামু, আকাল, কালী, গোবিন্দ, রঘু, আশঙ্কা এরা প্রত্যেকেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সুপরিচিত কর্মী। প্রত্যক্ষদর্শীদের আরও অভিযোগ, পুলিশের সহযোগিতাতেই এরা দাঙ্গাবাজি এবং লুটতরাজ চালিয়েছিল। এলাকার সুপরিচিত 'কমরেড' ভালুকও এই ঘটনার পিছনে মদত দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ উঠেছিল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এক জোনাল কমিটির সদস্য এবং পুরসভার জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধেও। গার্ডেনরিচেও দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় যেসব সমাজবিরোধী অংশগ্রহণ করেছিল, তারাও এলাকায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মদতপুষ্ট বলেই বারবার অভিযোগ উঠেছে। গার্ডেনরিচ এবং মেটিয়াবুরুজের এই দাঙ্গার ক্ষেত্রেও পুলিশ বাহিনী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করেন। তাঁদের অভিযোগ, ৬ ডিসেম্বর যখন এই দাঙ্গার ঘটনা ঘটে তখন পুলিশ ছিল অদ্ভুতভাবে নিষ্ক্রিয়। লিচুবাগান বস্তি জ্বলছে, অথচ পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখছে। কাশ্যপপাড়া থেকে থানার দূরত্ব মাত্র কয়েক মিনিট। অথচ ওখানে যখন দাঙ্গা লেগেছে, তখন পুলিশ যায়নি। পুলিশের সাহায্যের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, পুলিশ স্থানীয় মানুষকে শুনিয়েছে 'অর্ডার নেই।' স্থানীয় মানুষের আরও অভিযোগ, হাঙ্গামা ঠেকাতে পুলিশ ন্যূনতম উদ্যোগ না নিলেও, পরে অপরাধী ধরার নাম করে বহু নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে। বহু নিরীহ মানুষকে মেরে হাত-পা ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। এঁদের মধ্যে শিক্ষকও আছেন। অথচ দাঙ্গার মূল অভিযুক্তদের টিকিই ছোঁয়নি পুলিশ। অবশ্য গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজে পুলিশের সঙ্গে সমাজবিরোধীদের আঁতাতের অভিযোগ বহুদিনের। মার্ক্সবাদী সরকারের এক মন্ত্রী এখানে সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দিয়ে থাকেন বলেও অনেকদিনের অভিযোগ।

অথচ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টিকেই মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার আগে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বড়ো ইস্যু করেছিল! অন্য কোনও বক্তব্যে যাবার আগে পরিসংখ্যানের দিকেও একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ীই এ রাজ্যে ৫৭ থেকে ৬১ সালের ভিতর খুনের ঘটনা ঘটেছিল ২৫০৩টি। ৬২ থেকে ৬৭টির ভিতর ঘটেছিল ২৬৬৪টি। ৭২ থেকে ৭৭-এর ভিতর ৪৩০৫টি। এবং ৭৭-এর জুন মাস থেকে এই পর্যন্ত ২৫ হাজারেরও বেশী! যে ৭২-৭৭-এর আইনশৃঙ্খলা নিয়েই সব থেকে বেশি সরব ছিল মার্ক্সবাদীরা, সেই সময়টুকুর সঙ্গে মার্ক্সবাদী শাসনের কোনও একটি সময়ের তুলনা করা যাক। ৭২-৭৭-এ খুনের ঘটনা

ঘটেছিল ৪৩০৫টি। অথচ, মার্ক্সবাদী জমানায় ৮১ থেকে ৮৪-র ভিতর খুনের ঘটনা ঘটেছে ৭০৫৩টি! এই হচ্ছে চিত্র।

এর থেকে কতগুলি বিষয় সহজেই অনুধাবনযোগ্য। ক্ষমতায় আসার আগে মার্ক্সবাদীরা কংগ্রেসি নেতা এবং মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মস্তান এবং সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দেবার অভিযোগে সরব ছিলেন। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় আসার পর তাঁদের আমলের এই ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা প্রত্যেকেই আজ মস্তান এবং সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দিচ্ছেন। মস্তান এবং সমাজবিরোধীরা পার্টির ছত্রছায়া পাচ্ছে। পার্টি আশ্রিত মস্তান এবং সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কংগ্রেস সরকার তার পুলিশকে বাধা দিয়েছে বলে মার্ক্সবাদীদের যে অভিযোগ ছিল, এইসব ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মার্ক্সবাদীদের আমলেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পার্টি আশ্রিত মস্তান-সমাজবিরোধী হলে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরাও বাধা দিয়েছে। এবং পাটি আশ্রিত মস্তান-সমাজবিরোধী হলে পুলিশ মার্ক্সবাদীদের আমলেও হাত-পা গুটিয়েই বসে রয়েছে। মার্ক্সবাদীদের চরিত্রবদলটা এবার সহজেই ধরা পড়ে।

সতের বছরের শাসন ক্ষমতায় মার্ক্সবাদীরা যেমন সাধারণ প্রশাসনকে সবল এবং গণমুখী করে তুলতে পারেননি, তেমনই পুলিশ প্রশাসনের ভিতরে তাঁরা রাজনীতি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেস আমলেও কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের একাংশকে এভাবে সরাসরি নিজেদের দলীয় কর্মী বানানো হয়নি। মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর পুলিশ বাহিনীতে জন্ম দিয়েছেন নন গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতি। এই সমিতি কার্যত পুলিশ বাহিনীর ভিতর মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিরই শাখা সংগঠন। পুলিশের ভিতর এভাবে একটি রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন গড়ে ওঠার ফলে কী হয়েছে? প্রথমত, পুলিশের মতো শৃঙ্খলারক্ষা বাহিনীর ভিতর যে শৃঙ্খলাপরায়ণতা থাকার কথা রাজনীতির অনুপ্রবেশে তা নষ্ট হয়ে গেছে। পুলিশ বাহিনীর একটি অংশ নিজেদের রাজনৈতিক দলমতের ঊর্ধ্বে ওঠা শৃঙ্খলারক্ষা বাহিনী হিসেবে না ভেবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সমর্থক হিসেবে আগে ভাবছে। যার ফলে, নিজেদের সরকার ক্ষমতায় আছে, এই ধরে নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার সাহস পাচ্ছে তারা। শুধু তাই নয়, পার্টি আশ্রিত মস্তান সমাজবিরোধীদের প্রতি ব্যবস্থা নিতেও তারা গা ঘামাচ্ছে না। বরং, বিরোধী দলগুলির আন্দোলন ঠেকাতে তারা মারমুখী মনোভাব দেখাচ্ছে। পার্টির অনুগত হওয়ায় এদের প্রমোশন হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ জায়গায় ট্রান্সফার বা পোস্টিং-ও হচ্ছে। পুলিশ বাহিনীর ভিতর এই রাজনীতির অনুপ্রবেশ দেখে আবার বাহিনীর একটি অংশ তাদের কাজের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে ফেলছে নৈতিক সাহসও। পার্টি অনুগত পুলিশকর্মীদের চাপের মুখে তারা বাহিনীতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এর ওপর তো আছে রাজনৈতিক দলের সরাসরি হস্তক্ষেপ। আই পি এস অফিসারদের বদলি এবং পদোন্নতির তালিকা তৈরি হচ্ছে এখন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সদর দপ্তর থেকে। রাজ্য সদর দপ্তর থেকে তৈরি করে দেওয়া তালিকাই সরকারিভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্যকে পুলিশ বাহিনী নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই ক্ষমতাটি রয়েছে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য রবীন সেনের হাতে।

পুলিশ বাহিনীতে এভাবে রাজনীতি ঢোকায় কিন্তু কিছু আই পি এস অফিসারও

তার সুযোগ নিচ্ছেন। নিজেদের চাকরির উন্নতি এবং নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার জন্য এঁরা পার্টির হুকুম অম্লানবদনে তামিল করে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করছেন। এবং পার্টির হুকুম এভাবে অম্লানবদনে তামিল করে যাওয়ার বদলে এঁরা নানাবিধ বেআইনি কাজ-কারবারও অবাধে করে চলেছেন। কোনও মহল থেকেই সেসব বেআইনি কাজ-কারবারে বাধা আসছে না। এর সব থেকে বড়ো উদাহরণ একজন অবাঙালি আই পি এস অফিসার। সল্টলেকে ইনি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাসাদোপম অট্টালিকা বানিয়েছেন। অভিযোগ আছে যে, উনি যখন উত্তর চব্বিশ-পরগণা জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন তখন জেলার প্রতিটি থানা থেকেই প্রতি মাসে ওঁর জন্য নির্দিষ্ট 'তোলা' বরাদ্দ ছিল। এই আই পি এস অফিসার মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের ঘনিষ্ঠ হবার সুবাদে ওঁর চাকরিতে প্রমোশনই হয়েছে।

রাজনীতির অনুপ্রবেশ, সমাজবিরোধীদের সঙ্গে দহরম মহরম এসবের ফলে পুলিশ যে কতখানি অসহায় এবং অপদার্থ তার একটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। কালীঘাট অঞ্চলে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীর নাম শ্রীধর দাস। শ্রীধর দাসের নামে খুন এবং দাঙ্গাবাজির অভিযোগ রয়েছে। তুষার তালুকদার কলকাতা পুলিশের কমিশনার হয়ে আসার পর ঘোষণা করেছিলেন, দু মাসের ভিতর তিনি শ্রীধর দাসকে গ্রেপ্তার করবেন। কিন্তু দু মাস কেন, দু বছরের ভিতরও তিনি শ্রীধর দাসের টিকি ছুঁতে পারেননি। পুলিশের পক্ষ থেকে সেই সময় বলা হয়েছিল, শ্রীধর দাস আত্মগোপন করে থাকার জন্যই তাকে ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। কালীঘাট অঞ্চলের অধিবাসীরা বলেছেন, শ্রীধর দাস কালীঘাট অঞ্চলে ঘুরে গেছে। পুলিশ তাকে দেখেওছে, কিন্তু ধরেনি। এমনকি, ৯২ সালে বালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের সময় এই শ্রীধর দাসকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এক বিধায়কের গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াতেও দেখা গেছে। কিন্তু তাও তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। কালীঘাটেরই আর এক সমাজবিরোধী স্বপন কেওড়াতলা শ্মশানে সত্যজিৎ রায়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় কলকাতা পুলিশের তদানীন্তন কমিশনার বীরেন সাহাকে 'সাহাদা' বলে ডেকেছিল। তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বিপ্লব দাশগুপ্ত এবং তাবড় তাবড় আই পি এস অফিসারদের সামনেই তাণ্ডব করার সাহস সেদিন স্বপন পেয়েছিল।

সমাজবিরোধীদের এভাবে মদত দেওয়ার পিছনে রাজনৈতিক এবং পুলিশি আঁতাতের সব থেকে বড়ো উদাহরণ তো সাট্টা ডন রশিদ খান। রশিদ খানের সঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একাধিক তাবড় তাবড় নেতা-নেত্রীর যোগাযোগের ঘটনা যেমন আজ প্রমাণিত—তেমনই, আই পি এস-আই এ এস অফিসারদের সঙ্গেও তার যোগাযোগের কথা শোনা যায়। এক প্রাক্তন আই এ এস অফিসার রশিদ খানের বাঈজি বাড়িতে নিয়মিত মনোরঞ্জনের জন্য যেতেন বলে প্রকাশ পেয়েছে। আর এক প্রাক্তন আই এ এস অফিসারের মেয়েকে রশিদ খান একটি ফ্রিজ উপহার পাঠিয়েছিল বলেও জানা গেছে। একাধিক আই পি এস অফিসারের নাম এখন শোনা যাচ্ছে, যাঁদের জন্য রশিদ খান নিয়মিত মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করত এবং দামি দামি ভেট পাঠাতো।

সাধারণ প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এই হতাশা ছাড়া মার্ক্সবাদীরা তাঁদের সতের বছরের শাসন ক্ষমতায় আর কিছু আঁকতে পারেননি।

বারো

প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই যে তাঁদের চরিত্র বদল ঘটে গেছে গত সতের বছরে এই সারসত্যটিকেই কিন্তু মার্ক্সবাদীরা সহজে স্বীকার করতে চান না। গণতান্ত্রিক-মানবিক অধিকার সমূহকে যে চোখে তাঁরা দেখতেন, যে মনোভাব ছিল তাঁদের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি—ক্ষমতায় আসার পরে যে তাঁরা সে চোখে আর বিষয়টিকে দেখেন না, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের প্রতিও যে তাঁদের সেই আগেকার মনোভাব আর অক্ষুন্ন নেই, প্রকাশ্যে মার্ক্সবাদীরা এটাকে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবেন না। যে জীবনযাপন তাঁদের আদর্শ ছিল, যে জীবনযাপনের কথা তাঁরা বলতেন—সে জীবনযাপনের থেকে যে গত সতের বছরে মার্ক্সবাদীরাই শতহস্ত দূরে সরে এসেছেন, ব্যক্তিগত সেই সততা-নিষ্ঠাও যে আর আগের মতো অটুট নেই, বেনোজলের মতো পার্টিতেও যে ঢুকে পড়ছে নানারকম সুবিধাভোগী শ্রেণী, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কখনও কখনও তা স্বীকার করলেও সর্বাংশে কিন্তু মার্ক্সবাদীরা এখনও তা স্বীকার করেন না। নিজেদের পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও, তাকে ঢেকে রাখার এই যে প্রয়াস মার্ক্সবাদীদের তা একটু তুলে ধরি।

যে বিষয়টি কেন্দ্র করে মার্ক্সবাদীদের চরিত্র বদল নিয়ে নানারকম প্রশ্ন উঠেছে এখন বিভিন্ন মহলে, সেই বিষয়টি হল এই রাজ্যের মার্ক্সবাদী সরকারের নতুন শিল্পনীতি। এই শিল্পনীতি কেমন হতে পারে—সে সম্বন্ধে একটি রূপরেখা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ৯৪-এর সেপ্টেম্বরেই বিধানসভায় ঘোষণা করে দিয়েছেন। যে বহুজাতিক, বিদেশী এবং বেসরকারি পুঁজিকে ডেকে আনার ঘোর বিরোধী ছিলেন মার্ক্সবাদীরা, সেই বহুজাতিক, বিদেশী এবং বেসরকারি পুঁজিকেই পশ্চিমবঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের এই নতুন শিল্পনীতিতে। এক্ষেত্রে মার্ক্সবাদীদের বক্তব্য অবশ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের ফলে এ রাজ্যে শিল্পায়নের পথে যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে, সেই অন্তরায়কে দূর করতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বাধ্য হয়ে বেসরকারিকরণের কথা বলতে হচ্ছে। বলতে হচ্ছে বহুজাতিক এবং বেসরকারি পুঁজিকে স্বাগত জানানোর কথা। অবশ্য এই নতুন শিল্পনীতি নিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে বিরোধ রয়েছে। বিরোধ রয়েছে বামফ্রন্টেও। এই শিল্পনীতির মূল উদ্যোক্তা জ্যোতি বসু। এবং এই শিল্পনীতিকে কার্যকর করতে মূল উদ্যোগী হয়েছেন পার্টির পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা শাখার কমরেডরাই। কিন্তু ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের মতো প্রবীণ মার্ক্সবাদী নেতারা এই নীতির বিরোধিতা এখনও পর্যন্ত করেই চলেছেন। কেরল পার্টির একটি বড়ো অংশও এই নীতির বিরুদ্ধেই। তা সত্ত্বেও নিজের প্রভাবে এবং ব্যক্তিগত জোরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোর কাছ থেকে তাঁর নতুন শিল্পনীতি অনুমোদন করিয়ে এনেছেন জ্যোতি বসুই। রাজ্য বামফ্রন্টেও প্রথম থেকেই এই শিল্পনীতির বিরোধী ছিল ফ্রন্ট শরিক আর এস পি। শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হয়ে তারা অবশ্য এই নীতিকে মেনে নিয়েছে।

জ্যোতি বসুর এই নতুন শিল্পনীতিতে কতখানি শিল্পায়ন সম্ভব হবে সে পরের কথা। কিন্তু এই নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে 'কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের' যে দোহাই এখন পাড়ছেন মার্ক্সবাদীরা, তা কতখানি ঠিক? প্রকৃত ঘটনাগুলি কিন্তু অন্য কথা বলছে। প্রকৃত ঘটনাগুলি বিচার করলে দেখা যাবে, এখন যাই বলুন

না কেন মার্ক্সবাদীরা, ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বেসরকারিকরণের কাজ তাঁরা করেই চলেছেন। কাজেই এখন হঠাৎ করে বেসরকারিকরণ বা বিদেশি পুঁজির আমন্ত্রণের যে নতুন শিল্পনীতির কথা তাঁরা বলেছেন—তা আদৌ নতুন নয়। ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মার্ক্সবাদীরা যেভাবে বেসরকারিকরণ করে আসছেন, তা তুলে ধরছি। খড়্গপুরে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুটার (দিগ্বিজয় ব্র্যাণ্ড) রাজ্য সরকারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ ছিল। ৮০ দশকের গোড়ার দিকে এটিকে বেসরকারি মালিকানার হাতে তুলে দেন মার্ক্সবাদীরা। কোম্পানিটির নাম বদলে হয় অরবিন্দ বেনালি। কোম্পানিটি অবশ্য বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। রাজ্য সরকারের ইলেকট্রনিক্স ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত পনেরটা চালু ইউনিটের মধ্যে যেগুলি লাভজনক ছিল, বা যেগুলিতে লাভ হতে চলেছিল, সেগুলোকে সরকার প্রথমে ব্যক্তি মালিকদের সঙ্গে যৌথভাবে চালাতে শুরু করে, যেমন, ওয়েবেল কার্বন অ্যাণ্ড মেটাল ফিল্ম রেসিসটর্স, ওয়েবেল সেন ক্যাপাসিটরস, ওয়েবেল নিক্কো ইলেকট্রনিক্স, ওয়েবেল টুল সিস্ত, ওয়েবেল জেনসন নিকলসন, ওয়েবেল কম্যুনিকেশন, ওয়েবেল ইলেকট্রোসেরামিকস প্রভৃতি। এরপর এইসব যৌথ উদ্যোগে ভালো করে লাভ করা কয়েকটা ইউনিটকে পুরোপুরি ব্যক্তি মালিকানায় তুলে দেওয়া হয়। যেমন, ওয়েবেল টেলিম্যাটিক্স। ৯২ সালে এটি যৌথ উদ্যোগে গিয়েছিল। ৯৪ সালে এটি বহুজাতিক সিমেন্স কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর নাম বদলে হয় সিমেন্স টেলিম্যাটিক্স। ওয়েবেল নিক্কোরও পরিচালনভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নিক্কো গ্রুপের ম্যানেজমেণ্টের হাতে।

ভারত ইলেকট্রিকালস কারখানাটিও রাজ্য সরকার কিনে নিয়ে চার বছর বন্ধ অবস্থায় ফেলে রাখে। শেষে এ কে সাহার কাছে ওই কারখানাটি বিক্রি করে প্রচুর লাভ করে রাজ্য সরকার। কিন্তু এই লাভের এক পয়সাও কর্মচ্যুত শ্রমিকদের দেয়নি মার্ক্সবাদীদের সরকার। এরকম ভাবেই রিৎজ কন্টিনেণ্টাল হোটেলটি কিনে নিয়ে, সেটি না খুলে তা পিয়ারলেস গ্রুপের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। অবশ্য লাভ করেই। মার্ক্সবাদীদের আমলেই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে গোয়েঙ্কাদের। রাজ্য সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিশারিজ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটা মাছ চাষ প্রকল্পই লাভজনক। এর ভিতর লাভজনক ও সম্ভাবনাময় 'মীনদ্বীপ চিংড়ি প্রকল্প' জাপানি বহুজাতিকের হাতে দিয়ে দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের প্রসঙ্গটি দেখা যাক। খাতায় কলমে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল লাভজনক রাজ্য সরকারি সংস্থা। ইস্কোকে বেসরকারিকরণের সময় মার্ক্সবাদীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, রুগ্ন শিল্প হিসেবে ইস্কোকে বি আই এফ আর-এ না পাঠিয়ে তা সরাসরি বেসরকারিকরণ করার সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হল? কিন্তু গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ব্যাপারে দেখা গেল, মার্ক্সবাদীরাও এই একই অবস্থা অবলম্বন করলেন। ইস্কোর ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের জন্য গ্লোবাল টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল। গ্রেট ইস্টার্নের ক্ষেত্রে কিন্তু গ্লোবাল টেণ্ডারও দেওয়া হয়নি। সরাসরি তা এক ফরাসি বহুজাতিক সংস্থার হাতেই তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, নতুন শিল্পনীতি প্রণয়নের সময়ও মার্ক্সবাদীরা যতই 'কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের' যুক্তি দেখান না কেন, আসলে এই ক্ষেত্রেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল ঘটেছে ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর

সেই বদলটাকে তাঁরা স্বীকার করতে চাননি। ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এক্ষেত্রেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল যে ঘটেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কথাতেও। বামফ্রন্ট সরকারের সূচনাতেই জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। কিন্তু এটাও আমরা ভালভাবেই জানি যে পুঁজিপতিদের সঙ্গেই আমাদের কাজ করতে হয়। রাতারাতি তো দেশে সমাজতন্ত্র আসে না। আমাদের নীতি এবং স্বার্থ পুঁজিপতিদের বুঝতে দিন। সেই সঙ্গে আমরাও তাঁদের (পুঁজিপতিদের) বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করব।'

এই চরিত্র বদলের পাশাপাশি কিন্তু মার্ক্সবাদীদের চরিত্রের কণ্ট্রাডিকশনগুলিও বারবার সকলের চোখে ধরা পড়েছে। যেমন শিল্পনীতির প্রসঙ্গটিই আবার ধরা যাক। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া অর্থনীতি বা গ্যাট চুক্তির বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদীরা এ রাজ্যে সরব হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অর্থনীতি এবং গ্যাট চুক্তির বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদীরা প্রচার আন্দোলন চালিয়েছেন, রেল রোকো করেছেন, করেছেন বাংলা বন্‌ধও। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতির সঙ্গে মার্ক্সবাদী সরকারের নয়া শিল্পনীতির মূলগত কোনও পার্থক্য নেই। দু জায়গাতেই বেসরকারিকরণ এবং বিদেশি পুঁজিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পথ অনুসরণ করার পরও মার্ক্সবাদীরা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলছেন।

এই মার্ক্সবাদী সরকার এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য সমর্থকরা গত কয়েক দশক ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার বিরোধিতা করে আসছেন। এর প্রতিবাদে এ রাজ্যে বড়ো ধরনের আন্দোলনও করেছেন তাঁরা। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁদের চরিত্রের কণ্ট্রাডিকশনই ধরা পড়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থাগুলি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ নেওয়ার বিরোধিতা করেছেন যে মার্ক্সবাদীরা, তাঁরাই কিন্তু এ রাজ্যে ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির থেকে সমানে ঋণ নিয়ে চলেছেন। এ রাজ্যে বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির থেকে ঋণ নিয়ে এগারোটি প্রকল্প চালু আছে। এবং এই এগারোটি প্রকল্পে এ পর্যন্ত ঋণ নেওয়া হয়েছে ৯,৫০০ কোটি টাকা। আর ৯৮ সালের মধ্যে এই প্রকল্পগুলিতে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থাগুলি ঋণ দেবে আরও ১,১১৬ কোটি টাকা। এই ঋণের সুদ বাবদই মার্ক্সবাদী সরকারকে ৯১-৯২-এর রাজ্য বাজেটে ২০০ কোটি টাকা সরিয়ে রাখাতে হয়েছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি জনকল্যাণমুখী খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে এই সুদের টাকা যোগাড় করতে হয়েছিল মার্ক্সবাদী রাজ্য সরকারকে।

মার্ক্সবাদীদের চরিত্র বদল এবং তাঁদের চারিত্রিক কণ্ট্রাডিকশনেব বিষয়টি আরও ভালোভাবে ফুটে উঠবে যদি আমরা উদ্বাস্তু আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকাটি খতিয়ে দেখি। এ রাজ্যে জন্মলগ্ন থেকেই মার্ক্সবাদীদের একটি জবরদস্ত সংগঠন ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু বাঙালিদের ভিতরে। দেশবিভাগের ফলে যেমন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্বন্ধে এই উদ্বাস্তু বাঙালিদের ক্ষোভ জমা হয়েছিল, তেমনই পাশাপাশি মার্ক্সবাদীদের প্রতি একধরনের সহানুভূতি এবং সমর্থনও জন্মেছিল তাদের ভিতরে। মার্ক্সবাদীরাও তাই গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন, নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে গেলে উদ্বাস্তু বাঙালিদের ভিতর তাঁদের সংগঠন ভালোভাবে

গড়ে তুলতে হবে। সেই সংগঠন তাঁরা গড়ে তুলেও ছিলেন। ৬৭, ৬৯ এবং পরে ৭৭-এ তাঁদের ক্ষমতায় আরোহনের পিছনে এই উদ্বাস্তু ভোট ব্যাঙ্ক অনেকখানি কাজ করেছিল। এই উদ্বাস্তুদের ভিতর নিজেদের সংগঠন শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে মার্ক্সবাদীরা তাই জোরদার আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। বিরোধী নেতা থাকার সময় জ্যোতি বসু বিধানসভায় এই উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য জোর সওয়াল করেছিলেন। ১৯৭৪-এ একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে জ্যোতি বসু এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় এলে দন্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বসবাসরত উদ্বাস্তুদের তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। ১৯৭৪-৭৫-এ মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য নেতারাও এই আশ্বাস দিয়েছিলেন উদ্বাস্তুদের। সেই আশ্বাসকে মনে রেখেই মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর দণ্ডকারণ্য থেকে প্রায় দেড় লক্ষ উদ্বাস্তু এসে হাজির হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু, তখন মার্ক্সবাদীরাই আবার জোর করে তাদের দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠান। ১৯৭৮-এর মে মাস নাগাদ সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে প্রায় তিরিশ হাজার উদ্বাস্তু এসে হাজির হন পশ্চিমবঙ্গে। এই সতীশ মণ্ডল একসময় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা ছিলেন। এই উদ্বাস্তুরা এসে মরিচঝাঁপিতে বসতি গড়ে তোলেন। নিজেদের পরিশ্রমেই এখানে তাঁরা মৎস্যচাষ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, বসতি গড়ে তোলেন। কিন্তু মার্ক্সবাদী সরকার মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের এই বসতি স্থাপন মেনে নেননি। মার্ক্সবাদী সরকার তখন বলেন, 'মরিচঝাঁপিতে বসতি করে সংরক্ষিত বনাঞ্চল আইনকেই অমান্য করেছেন উদ্বাস্তুরা।' বলা দরকার, মরিচঝাঁপি জায়গাটি সুন্দরবনে অবস্থিত। মরিচঝাঁপি এলাকায় প্রথমে মার্ক্সবাদী সরকার অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তোলে। খাদ্য এবং জলের সন্ধানে উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপির বাইরে বেরতে বাঁধা দেয় প্রশাসন এবং পুলিশ। ১৯৭৯ সালের ৩০ জানুয়ারি উদ্বাস্তুদের নৌকাগুলি ডুবিয়ে দেয় পুলিশ। পরদিন, ৩১ জানুয়ারি উদ্বাস্তুদের ওপর বেপরোয়া গুলি চালানো হয়। তাতে ৩৬ জন মারা যান। উদ্বাস্তু বসতিতে ব্যাপক লুঠতরাজ এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। মরিচঝাঁপির চারদিকে অবরোধ গড়ে তোলার ফলে ৪৩ জন অনাহারে, এবং ২৯ জন নানারকম অসুখে মারা গিয়েছিলেন। পুলিশ নৌকা ডুবিয়ে দেওয়ার ফলে আরও ১২৮ জন মারা যান। অভিযোগ ওঠে, পুলিশ গুলি চালিয়ে অনেক স্ত্রী ও শিশুকেও হত্যা করে। এবং পরে তাদের মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এতবড় এবং বীভৎস গণহত্যার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে আর কখনও সংঘটিত হয়নি। পরে কিন্তু এই মরিচঝাঁপিতেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সমর্থকদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তখন আর সংরক্ষিত বনাঞ্চল আইন লঙ্ঘন করার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। এবং এই ভয়াবহ ঘটনার পরও উদ্বাস্তুদের নানারকম দাবি-দাওয়া নিয়ে মার্ক্সবাদী নেতারা সরব হয়েছেন। নানারকম আশ্বাসও দিয়েছেন। চরিত্র বদল এবং কনট্রাডিকশনের এর থেকে বড়ো নজির আর কী হতে পারে?

মার্ক্সবাদীদের চরিত্র বদলের এই চিত্র থেকে কিন্তু এটাই শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার হচ্ছে যে, প্রশাসনের সর্বস্তরেই গত সতের বছরে মার্ক্সবাদী সরকার ব্যর্থই হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে বলেই প্রশাসনকে সবল এবং গণমুখী করে তোলা যায়নি। দুর্নীতি দূর করা যায়নি। পুলিশকে দিয়ে মোকাবিলা করতে হয়েছে গণআন্দোলনগুলি। আর মার্ক্সবাদী সরকারের এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ কিন্তু, ক্ষমতায় আসার পর তাঁদের চরিত্রটি

বদলে যাওয়াই। বেনোজলের মতো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি পার্টিতে ঢুকে পড়া, চারদিকে স্বার্থান্বেষী এবং ভাগ্যান্বেষীদের ভিড় হয়ে যাওয়া—এগুলিই তাঁদের সরকারকে সত্যিকারের জনগণের সরকার করে তোলার পক্ষে তাঁদের কাছে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়েছে মার্ক্সবাদীদের প্রশাসন তারও কয়েকটা উদাহরণ দিই।

মার্ক্সবাদীদের সব থেকে গর্বের জায়গা শিক্ষা। সাক্ষরতা অভিযানের ব্যাপক সাফল্যের কথাও মার্ক্সবাদীরা গত কবছর ধরেই প্রচার করে চলেছেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য অন্য কথা বলছে। মার্ক্সবাদীরা যে দাবি করছেন, তথ্য কিন্তু তাকে সমর্থন করছে না। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, ২৫টা রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভিতর সাক্ষরতায় এ রাজ্যের স্থান ১৮তম। এই রিপোর্ট থেকেই জানা যাচ্ছে, রাজ্য বাজেটের বড়ো অংশ মার্ক্সবাদী সরকার শিক্ষাখাতে খরচ করার বড়াই করলেও, রাজ্য বাজেটে শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ পরিকল্পনাবহির্ভূত খাতেই বেশি। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ সে তুলনায় নামমাত্র। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বর্হিভূত খাতে ব্যয়বরাদ্দের দিক দিয়ে সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয়। ১৯৯২-৯৩ সালের রাজ্য বাজেটে শিক্ষার জন্য মোট ১৭৪৪.০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর ভিতর পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৪২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বাজেটে শিক্ষার জন্য মোটা অংশ বরাদ্দ করা হলেও, তার অধিকাংশটাই পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতেই খরচা করা হয়ে থাকে।

আবার, এই পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর ভিতর পড়াশোনা ছেড়ে দেবার শতকরা হার জাতীয় হারের থেকে অনেক বেশি। এ ব্যাপারে জাতীয় হার হল ৭৬.৪৬ শতাংশ। আর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া ছাত্রছাত্রীর হার ৮৪.৫৮ শতাংশ। এই ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ।

এ রাজ্যে মার্ক্সবাদীদের আর একটি গর্বের জায়গা হল পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা। এই ক্ষেত্রেও কী অবস্থা হয়েছে, তার ছোট্ট বিবরণ তুলে ধরি। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, মার্ক্সবাদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম পাঁচবছর তাঁরা গ্রামাঞ্চলে যথেষ্টই উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তাঁদের প্রথম পাঁচ বছরের সেই উল্লেখযোগ্য কাজ বাদবাকি বছরগুলিতে তাদের সুফল যুগিয়ে এসেছে। প্রথম পাঁচবছরের ওই কাজের ফল পরবর্তীকালে গ্রামাঞ্চলে তাঁদের সংগঠন দৃঢ় এবং মজবুত হতেই সাহায্য করেছিল। ক্ষমতায় আসার পরে প্রথম পাঁচবছর মার্ক্সবাদীরা গ্রামাঞ্চলে যে কাজ করেছিলেন তা সতিই গণমুখী এবং জনকল্যাণকর। এর সবথেকে ভালো উদাহরণ, ৭৮ সালে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা। প্রথম পাঁচবছরের এই গণমুখী এবং জনকল্যাণমূলক কাজের ফলেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরবর্তীকালে বড় রকমের উন্নতিই এসেছে। এই উন্নতি একেবারে খালি চোখেই ধরা পড়ে। গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে এখন মোটরবাইক এবং টি ভি সেট কেনার পয়সা এসেছে। কিছুটা স্বাচ্ছল্যের পরিচায়ক হিসেবেই গ্রামে গ্রামে এখন ভিডিও হল হয়েছে। বন্যার সময়ে গ্রামের মানুষ অন্তত এখন আর দলে দলে শহরে ভিক্ষা করতে আসে না। শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ অনেক উন্নত হয়েছে। অধিকাংশ গ্রামই পাকা রাস্তা এবং পরিবহনের সুযোগ পেয়েছে।

কিন্তু, প্রথম পাঁচবছর কেটে যাবার পরই কিন্তু গ্রামেও মার্ক্সবাদীদের ঘিরে গড়ে উঠেছে ক্ষমতাভোগী এবং স্বার্থান্বেষী চক্র। উন্নয়নের টাকা যখন একেবারে ওপর তলা থেকে একেবারে নিচে পঞ্চায়েত স্তর অবধি এসেছে—তখনই টাকা এবং ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে স্বার্থান্বেষী এবং ক্ষমতাভোগীরা ভিড় বাড়িয়েছে মার্ক্সবাদীদের চারধারে। এই টাকা কামানোর গন্ধটি পেয়ে যাবার পরই দুর্নীতি এবং নয়ছয় শুরু হয়েছে। ওপরতলার মার্ক্সবাদীরাও ততক্ষণে নিজেদের লুটের ব্যবস্থাটি কায়েম রাখতে নিচের তলাতেও টাকা পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে রাজনৈতিক রঙ পাল্টে ফেলে জোতদাররাও তখন গিয়ে ভিড়েছে মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে। রাতারাতি পঞ্চায়েতের কর্তা হয়ে বসেছে তারা। টাকা ওড়ার কলটা জেনে যাবার পরই দেখা গেছে, পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদ সদস্যদের রাতারাতি বাড়িগাড়ি জমিজমা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা রাতারাতি নয়ছয় হয়ে গেছে। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখলে রাখতে মার্ক্সবাদীরাও তখন যে কোনও রকম উপায় গ্রহণ করেছে। ভোটের আগে বিরোধিতা করলে পুকুরের জলে ফলিডল মিশিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে, সংঘর্ষে বিরোধীদের উৎখাত করতেও দ্বিধা করেনি তারা। পঞ্চায়েতের দখলদারিতে তাদের এই রোষের কবলে পড়েছে তাদের শরিকরাও। মুর্শিদাবাদে ফরওয়ার্ড ব্লক, মেদিনীপুরে সি পি আই, গোসাবা-বাসন্তীতে আর এস পির সঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী-সমর্থকদের রীতিমতো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। ফ্রন্টের শরিক নেতারা কলকাতায় বসে আক্ষেপ করেছেন, নিচু তলায় ফ্রন্ট ঐক্য গড়ে তোলা যায়নি। আসলে লাভের গুড়টা সকলেই একা খেতে চায়, এবং, সেজন্যই নিচের তলায় ফ্রন্টের ঐক্য গড়ে তোলা যায়নি। প্রকাশ্যে অবশ্য সেটা আর তাঁরা স্বীকার করেননি। যে গণমুখী এবং উন্নয়নকামী মনোভাব নিয়ে গ্রামাঞ্চলে কাজ শুরু করেছিল মার্ক্সবাদীরা তার এমনই ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

কতোখানি ট্র্যাজিক সেই পরিসমাপ্তি তার দুটো উদাহরণ দিই। জাঁ দ্রেজে ((Jean Dreze) তাঁর 'পভার্টি ইন ইন্ডিয়া অ্যাণ্ড আই আর ডি পি ডিলিউশন' প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের এই করুণ চিত্রটি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে আই আর ডি পি (ইন্ট্রিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) এর আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পাটির কর্মী-সমর্থকরাই। কাজেই শ্রেণীগতভাবে সাহায্য পাবার বদলে এখানে পার্টিগত ভাবে সাহায্য পাওয়াটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। শতদল দাশগুপ্ত এবং রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁদের 'পার্টি পলিটিক্স, পঞ্চায়েত অ্যাণ্ড কনফ্লিক্ট ইন এ ওয়েস্ট বেঙ্গল ভিলেজ' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখতেই এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির আওতা থেকে অনেককে বাদ দেওয়া হয়েছে।' এঁদের লেখাতে এটাই ফুটে উঠেছে যে, পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত নিছক পার্টিবাজিতেই পরিণত হয়েছে।

এই পার্টিবাজি করতে গিয়ে কী ধরনের দুর্নীতি চলছে তা রস মালিক দেখেছেন। রস মালিক তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'রাজ্যের এক আই এ এস অফিসার, যিনি আই আর ডি পি প্রকল্পগুলি দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন, তিনি লক্ষ্য করে দেখেন যে, আই আর ডি পি প্রকল্প থেকে সাহায্য নিয়ে যারা পশম চাষের জন্য ভেড়া এবং ছাগল কিনেছিলেন, তারা বলছেন নানারকম রোগে এবং দুর্ঘটনায় ওই ভেড়া-ছাগলগুলি মারা যাচ্ছে। সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় ওই আই এ এস অফিসার তদন্তে নামেন।

তদন্তে নেমে তিনি দেখতে পান, প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে যারা এই ছাগল এবং ভেড়াগুলি কিনেছিলেন তারা তা বিক্রি করে দিয়েছেন। ঘুস দিয়ে পশুচিকিৎসকের কাছ থেকে জাল সার্টিফিকেট আদায় করে তারাই বীমার টাকা দাবি করছেন। আর এভাবেই দুহাতে বেআইনি অর্থ উপার্জন করছেন এরা।' দুর্নীতি শেষ পর্যন্ত এই স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

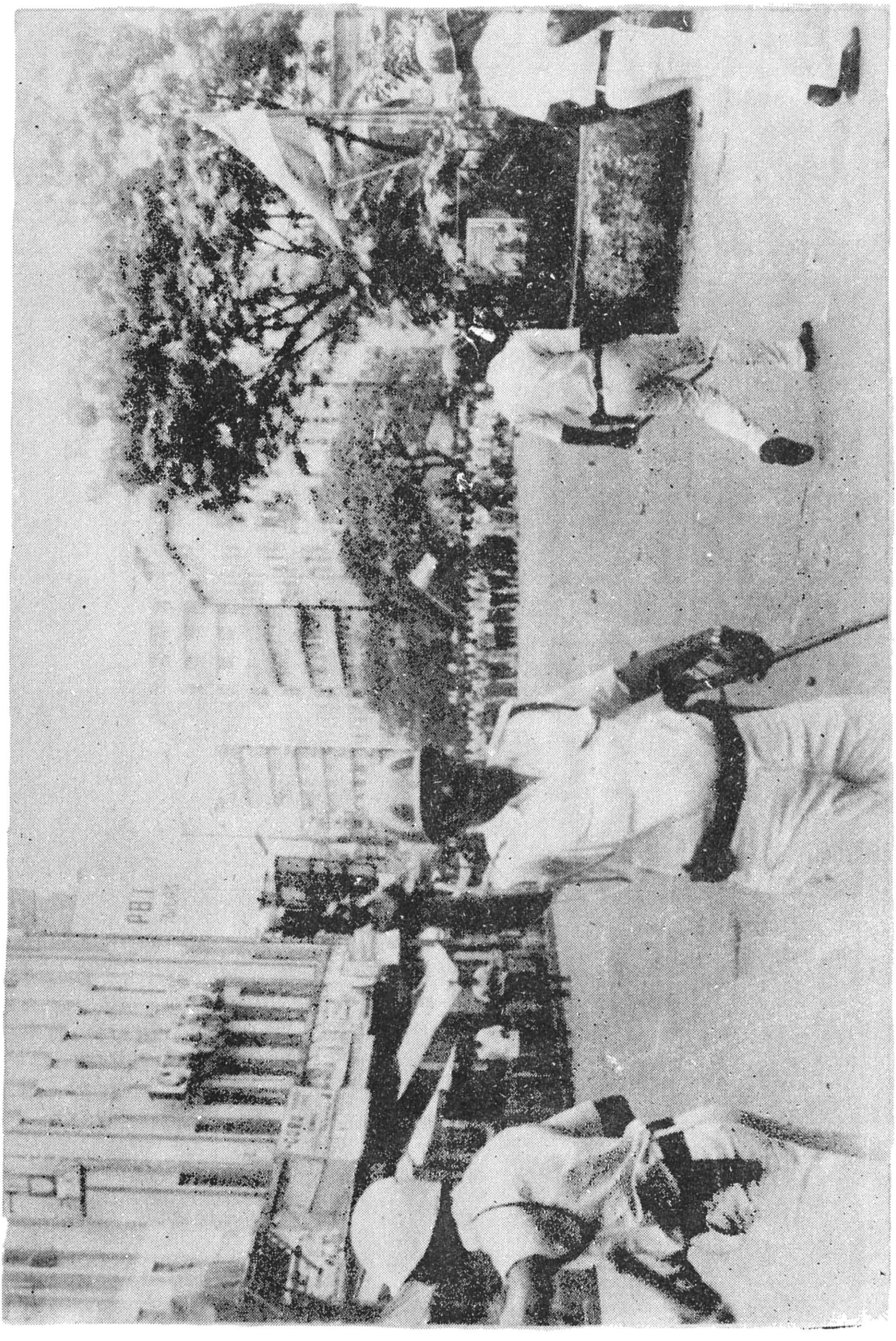
মার্ক্সবাদীদের এই শাসন যে এ রাজ্যে চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিতই হয়েছে শেষ পর্যন্ত, কোনও নতুন পথের দিশাই যে তাঁরা দেখাতে পারেননি, বরং তাঁরাও তাঁদের পূর্বসূরীদের মতোই সংসদীয় গণতন্ত্রের কানাগলিতে ঘুরেই মরেছেন, তা কিন্তু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও তাদের আন্তঃপার্টি দলিলে স্বীকার করেছে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটি দলের এই ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করেই নিজেদের আন্তঃপার্টি দলিলে তাই লিখেছে, 'যুব সম্প্রদায়ের কাছে বামপন্থার কথা এখন পুরনো হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। পুরনো আমলের কমিউনিস্ট নেতাদের যে আদর্শবাদ, সততা, স্বার্থত্যাগ, বৈভবহীন জীবনযাপন, শিক্ষা যুব সমাজকে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, সে অবস্থা এখন আর নেই। এখন আর অন্য রাজনৈতিক দলগুলির থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কোনও ফারাকই নেই। গত কয়েক বছর ক্ষমতায় থেকে আমাদের পার্টির নেতা এবং কর্মীরা এখন আমলা নির্ভর হয়ে পড়েছেন। পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী এখন আমাদের পার্টিকে গ্রাস করেছে পুরোপুরি। যে সংগ্রাম আমরা এসবের বিরুদ্ধে শুরু করেছিলাম, তা আর এখন দেখা যায় না। জনগণের সামনে আমাদের ইমেজও কালিমালিপ্ত হয়েছে। কেউ কেউ ভাবছেন নিচের তলার কর্মীদের ভিতরই শুধু পেটি বুর্জোয়া মনোভাব দেখা দিয়েছে। তা ঠিক নয়। উপরতলার পরীক্ষিত নেতারাও আজ শিকার হয়েছেন এই মনোভাবের। এর বিরুদ্ধে যদি আমাদের লড়াই করতে হয়, তাহলে সে লড়াই শুরু করতে হবে ওপর তলা থেকেই।'

জনগণের যে আশা-আকাঙ্খাকে সম্বল করে ৭৭ সালে মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতায় বসেছিলেন, গত সতের বছরের নানা ঘটনা, তাঁদের নানাবিধ কার্যকলাপই সেই আশা-আকাঙ্খাকে ধূলিসাৎ করেছে। সতের বছর পর জনগণ এখন আর নতুন করে পশ্চিমবাংলার মার্ক্সবাদীদের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করে না। মার্ক্সবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখতে মার্ক্সবাদীরা নিজেরাই যে ব্যর্থ হয়েছেন, সতের বছরে তাঁদের চরিত্রের বদল সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছে। সতের বছরে মার্ক্সবাদী শাসন ক্ষমতার ইতিহাস তাই স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। আশাপূরণের সোনালি কাহিনী নয়।



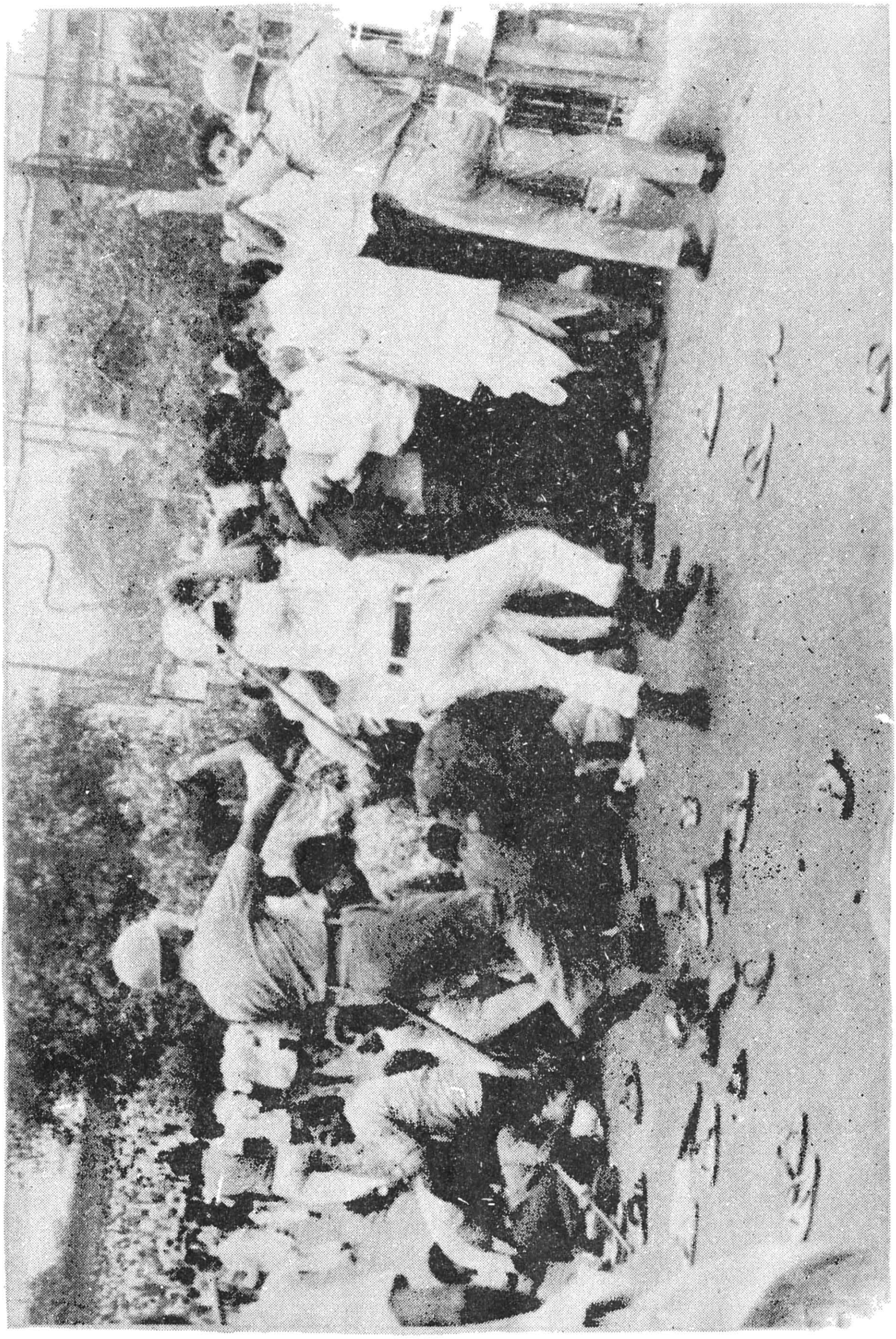
বালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন-৯২। পুলিশের গুলিতে নিহত স্বপন চক্রবর্তী।

ছবিঃ সুব্রত মজুমদার



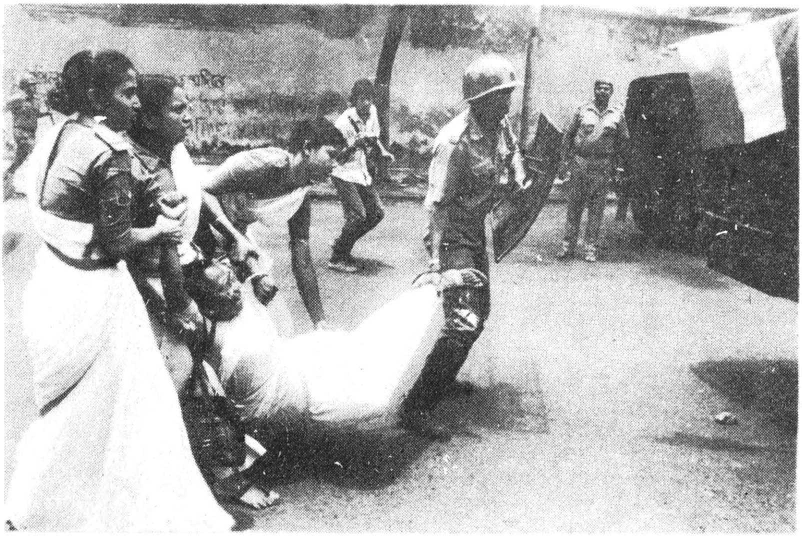
ব্রাবোর্ন রোডে বিক্ষোভের মোকাবিলায় রিভলভার হাতে পুলিশ।

ছবিঃ সুব্রত মজুমদার



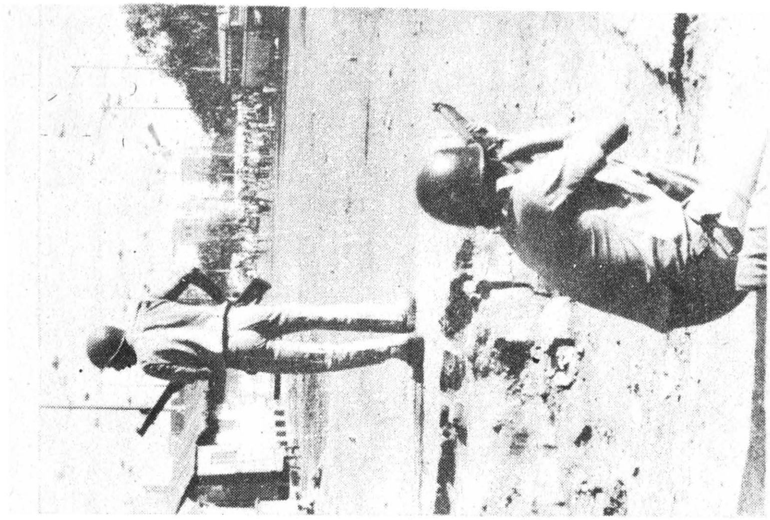
২১ জুলাই ১৯৯৩—জনতাকে ছত্রভঙ্গ করছে পুলিশ।

ছবিঃ সুব্রত মজুমদার



বাস-ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি—প্রতিবাদ আন্দোলন-৯২। আন্দোলনকারীকে চ্যাংদোলা করে ভ্যানে তুলছে পুলিশ।

ছবিঃ সুব্রত মজুমদার



২১ জুলাই ১৯৯৩—মেয়ো রোডে গুলি চালাচ্ছে পুলিশ।

ছবিঃ সুব্রত মজুমদার

পিভি-কে নালিশ করায় বসুর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ

নির্বাচন কমিশনকে পাপোশ করে রাখতে দেব না : শেষন

রিপোর্টার : এক দিকে 'ধুরন্ধর বামপন্থী বুদ্ধিজীবী' বলে ৪৬ বছরের এক রাজনৈতিক নেতা, অন্য প্রান্তে অধুনা প্রচণ্ড এক 'সিভিল সার্ভেন্ট'। প্রকাশ কারাতকে কিন্তু প্রায় তুড়ি দিয়ে দিলেন টি এন শেষন।

বলেন ?" তখন তাঁর সম্পর্কে ব্যবহৃত বাছা বাছা ... শুনতেই বিরলকেশ মাথাটা ... না-হতেই তাঁর —

অবরোধে রাজ্য বিপর্যস্ত বাসে আগুন, ভাঙচুর

ডি সি সদর বলেন, গোলপার্কে ১১টা থেকে ১ পর্যন্ত এক লোক পথ অবরোধ করে। গড়িয়াহাটের মোড়ে ১১টা থেকে ... পর্যন্ত অবরোধ হয়। হাতিবাগানে ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত ... হয়। এছাড়া বাগমারি, শ্যামবাজারে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে ১০টা ... পর্যন্ত অবরোধ হয়। এছাড়া বালিগঞ্জ ফাঁ... ধিকারীরা বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে একটি এস- ... চেতলাতেও বেশ কয়েকটি বাস ও মি... দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ২৪টি বাস ও ... এর মধ্যে ১৯টি সি এস টি সি, ১টি সি ... বাস। হাতিবাগানের কাছেও কিছু বাস ...

বলেন, এদিন দুপুর ২টো ৪০ মিনিটে জনা ... মহাকরণের সেন্ট্রাল গেটের সামনে আচমকা ... করেন। পরে এখান থেকে পুলিশ ২২ জনকে ... দারের সেন্ট্রাল লক আপে নিয়ে যায়।

গুলি চালানোর কথা অস্বীকার করেনি পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : সোমবার গার্ডেনরিচে মমতা ব্যানার্জির ওপর গুলি চালানোর ঘটনা পুলিশ পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেনি। বুধবার লালবাজারে ডি সি (সদর) চয়ন মুখার্জি বলেন, গুলি চালানোর ব্যাপারে আমরা কোনও মন্তব্য করব না। ডি সি পোর্ট বি ডি শর্মা বলেন, মমতা ব্যানার্জির ওপর হামলার সময় গুলি চলেনি। উনি ঘটনাস্থল ছেড়ে যাওয়ার পরে একটি ... খুটখাট গণ্ডগোল হয়। সে সময় গুলি চলেছে কিনা তা আমরা তদন্ত করে দেখছি। উল্লেখ্য, ... দিন মমতা ব্যানার্জির সঙ্গী আইনজীবী বিমান ব্যানার্জি হামলার ব্যাপারে দায়ের করা এফ ... আরে পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে হামলাকারীরা দুবার গুলি চালিয়েছে। স্থানীয় পুলিশ ... বলা হয়েছে, গুলি চলেছে। তবে কে বা কারা চালিয়েছে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। মমতা ব্যানার্জির ওপর গুলি চলেছে কিনা সে ব্যাপারে পুলিশ কর্তারা পরিষ্কার ... অথচ মঙ্গলবার পুলিশের পক্ষ থেকে আইনজীবী দর্পণ ... নাগাদ চার অভিযুক্ত ...

মোক্তারকে ছেড়ে দিল কেন পুলিশ?

স্টাফ রিপোর্টার : গার্ডেনরিচে গোলমা... দিন সন্ধ্যার মধ্যেই মোক্তারকে ... ধরেও ছেড়ে দিয়েছিল কেন? ... ব্যানার্জির ওপর গুলি চলেছে, ... চেপে যেতে সি পি এমের নির্দেশে ...